হুমায়ুন আজাদ

আততায়ীদের সঙ্গে কথোপকথন

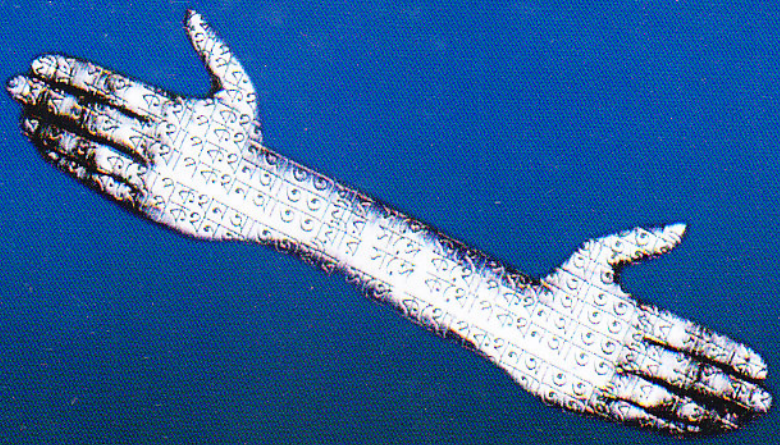

হুমায়ুন আজাদ

আততায়ীদের সঙ্গে কথোপকথন

আগামী প্রকাশনী

তৃতীয় মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ১৪১৯ নভেম্বর ২০১২

প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৪০১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫
দ্বিতীয় মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৭

স্বত্ব মৌলি আজাদ, স্মিতা আজাদ ও অনন্য আজাদ

প্রকাশক ওসমান গনি আগামী প্রকাশনী ৩৬ বাংলাবাজার
ঢাকা ১১০০ ফোন ৭১১-১৩৩২, ৭১১-০০২১

প্রচ্ছদ : শিবু কুমার শীল

মুদ্রণে স্বরবর্ণ প্রিন্টার্স ১৮/২৬/৪ শুকলাল দাস লেন, ঢাকা

মূল্য : ১৫০.০০ টাকা

Atatayider Sange Kathopakathan: Canversation with: he Assassins: A Collection of Interviews: Humayun Azad.

Published by Osman Gani of Agamee Prakashani
36 Bangla Bazar, Dhaka1100, Bangladesh
e-mail: info@agameeprakashani-bd.com
Third Print: November 2012

Price: Tk.150.00 only

ISBN 978 984 04 1542 7

উৎসর্গ

আমার সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীদের
যারা আমাকে রক্তাক্ত ক'রে বাঁচিয়েছে

আততায়িত ও আততায়ী

আমি একজন আক্রান্ত মানুষ একথা যদি বলি তাহলে বোধহয় অহমিকা প্রকাশ করা হয় না; কিন্তু এ-বইটি যাদের সহযোগিতায় গড়ে উঠেছে— আমি সাধারণ সর্বনাম ও ক্রিয়ারূপই ব্যবহার করছি, তারা সবাই আমার স্নেহভাজন— তাদের কথা ভাবতে কেনো আততায়ী শব্দটি আমার মনে এলো? বইটির নামের কথা যখন ভাবছিলাম আমার ভেতর থেকে এ-নামটিই জেগে ওঠে। বাংলাদেশে সাক্ষাৎকার এক শিল্পরীতি হয়ে উঠেছে; এবং আমি অজস্র সাক্ষাৎকার দিতে বাধ্য হয়েছি; অনেকেই আমাকে ঈর্ষা আর ঘৃণা করে থাকেন এজন্যে যে তাঁরা যোগ্যতর হওয়া সত্ত্বেও সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীরা তাঁদের দেখে না। সাক্ষাৎকার দিতে পারলে আমরা গৌরব বোধ করে থাকি; বড়ো অক্ষরে নাম ছাপা হয়, ছবিও ছাপা হয়, যা সাধারণত লেখকদের ভাগ্যে জোটে না, জোটে নায়ক আর খলনায়কদের ভাগ্যে। সাক্ষাৎকার যারা নিতে আসে, তারা অনুরাগী বলেই আসে; আমি নিজেকে বারবার জিজ্ঞেস করেছি ওই অনুরাগীদের কেনো আমার আততায়ী মনে হলো? সাক্ষাৎকার দিতে কি আমি স্বস্তি বোধ করি না, প্রতিটি সাক্ষাৎকারে কি আমি নিহত হই? ভেতর থেকে রক্ত বেরোয়? হয়তো নিহত হই, হয়তো রক্ত বেরোয়, আমি তা জানতে পারি না। এক সময় আমি মন দিয়ে বেশ নিকৃষ্ট ব্যক্তিত্বদের সাক্ষাৎকার পড়েছি পত্রপত্রিকায়, তখন কেউ আমার সাক্ষাৎকার নিতে আসতো না; আমার মনে হতো কেউ আমার সাক্ষাৎকার নিতে এলে আনন্দে আমার মন ভরে যাবে, এবং আমি সবচেয়ে সত্য আর গভীর কথাটি বলবো। তারপর এক সময় আমার কাছেও তারা আসতে থাকে, আমি ক্রমশ বিপন্ন থেকে বিপন্নতর হয়ে উঠতে থাকি। হয়তো যখন আমার কথাই বলতে ইচ্ছে করছে না, ঘেন্না লাগছে মানব ভাষা আর বর্ণমালাকে, তখনি একজন দূরালাপনিতে জানালো সে অবিলম্বে আসছে, এখনি একটি সাক্ষাৎকার দিতে হবে। না, না, না করেও তাকে ফেরাতে পারি না। সে দেখা দেয়; কখনো সাথে একজন চিত্রগ্রাহকও থাকে যে অপেক্ষাঘরের এককোণ থেকে আরেক কোণে ছুটতে থাকে, মেঝে খুঁড়ে ঢুকতে থাকে, দেয়াল বেয়ে উঠতে থাকে, সিলিংয়ে ঝুলতে থাকে একটি-দুটি খুব শিল্পিত আর খুব বিকৃত ছবি তোলার জন্যে। তার আক্রমণপর্ব শেষ হলে শুরু হয় নতুন আক্রমণপর্ব, যখন কথা বলার থেকে নিহত হতে বেশি ইচ্ছে করে।

সাক্ষাৎকার নিতে আসে চমৎকার সব তরুণেরা; অধিকাংশই ছাত্র, মাধ্যমিক থেকে স্নাতকোত্তর পর্বে পড়ে, দৈনিক বা সাপ্তাহিক নির্ভীক সাংবাদিকতা করে;

পনেরো-বিশ মিনিটে নিউজপ্রিন্টের প্যাড নিঃশেষ করে ফেলে। অবশ্য ঠিকমতো গুছিয়ে প্রশ্ন করতে পারে না কেউ কেউ, কেউ কেউ বড়ো বড়ো প্রশ্নে তৃপ্তি পায়, কেউ কেউ মনে করে আমি যদি বিগব্যাংয়ের আগের এক মিনিট সম্পর্কে নির্ভুল উত্তর দিতে না পারি, তাহলে আমি কিছুই পারি না। বাঙলাটাও মাঝেমাঝেই ভুল লিখতে পছন্দ করে তারা, আজকাল কে আর শুদ্ধ বাঙলা লেখার কষ্ট স্বীকার করে; যার সাক্ষাৎকার নিচ্ছে তার সম্পর্কেও পুরোপুরি ধারণা রাখতে তারা ঘেন্না করে; কিন্তু প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যায়। কেউ কেউ পিস্তলের মতো একটা ধারণযন্ত্র বের করে মুখের সামনে উঁচিয়ে ধরে; ফিরে গিয়ে ওই যন্ত্র থেকে কথাগুলো উদ্ধারে সময় নষ্ট না করে নিজের ভাষায়ই সাক্ষাৎকারটি লিখে দেয়, ছাপার পর দেখা যায় আমি যা বলেছি তার সাথে ছাপাবস্তুর কোনো মিল নেই। এখন আবার এক নতুন রীতির সাক্ষাৎকার দেখা দিয়েছে, তার নাম টেলিফোন সাক্ষাৎকার; টেলিফোন তুললেই শুনতে পাই, স্যার, প্যাকেজ সম্পর্কে আপনার কী মত, বিশ্বসুন্দরীর নাভি সম্পর্কে আপনার কী বক্তব্য, ধর্ষণ সম্পর্কে আপনার কী দর্শন? সাথে সাথে উত্তর দিতে হয়, উত্তর না দিলেও দেখা যায় আমার একটি সাক্ষাৎকার ছাপা হয়ে গেছে। তবে সব কিছু মিলে তাদের দ্বারা আততায়িত হতে আমার ভালোই লেগেছে। সাক্ষাৎকারগুলোতে বহু বিষয়ে আমি কথা বলেছি, খোলাখুলিভাবে বলেছি; এতে আমার স্বভাবের একটি বড়ো অংশ ধরা পড়েছে। আমার প্রথাবিরোধিতা, নির্মোহতা, শুদ্ধ সমাজ ও শিল্প ও সৌন্দর্যের জন্যে আমার কাতরতা ধরা পড়েছে। এ-বইটিতে অজস্র সাক্ষাৎকার থেকে বেছে কয়েকটি সাক্ষাৎকার সংকলিত হলো। সব সাক্ষাৎকার নিতে পারি নি, তাতে বই বেশ বড়ো হয়ে যেতো। এগুলোর প্রুফ পড়তে গিয়ে আমি ভয় পেয়ে যাই, দেখি পংক্তিতে পংক্তিতে ভুল বানান আর বাক্য ছড়িয়ে আছে। ওগুলো আমি শুদ্ধ করে দিলাম; তবে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীদের বহু প্রশ্নে বহু ভুল রয়েছে, সেগুলো আর শুদ্ধ করি নি। যে-সব পত্রপত্রিকায় সাক্ষাৎকারগুলো বেরিয়েছিলো, আর যারা নিয়েছিলো সাক্ষাৎকারগুলো, তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ— তারা উদ্যোগী না হলে আমার এ-বইটি বেরোতে না।

হুমায়ুন আজাদ

১৪ই ফুলার রোড
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকা
১৬ পৌষ ১৪০১; ৩০ ডিসেম্বর ১৯৯৪

সূচিপত্র

প্রবচনবিতর্ক; পক্ষে বিপক্ষে তুমুল লেখালেখি ১১
বাংলাদেশের সাহিত্য খুব একটা উঁচু মানের নয় ২১
হুমায়ুন আজাদের সাক্ষাৎকার ও এক চোখে দেখা : হুমায়ুন আজাদের উত্তর ২৯
কবি হুমায়ুন আজাদের বিশেষ সাক্ষাৎকার ৩৯
এ-সপ্তাহের ব্যক্তিত্ব : ডক্টর হুমায়ুন আজাদ ৪৮
হুমায়ুন আজাদের সাক্ষাৎকার ৫৬
কবিদের মুখোমুখি : হুমায়ুন আজাদ ৭৯
শুদ্ধতম লেখক হুমায়ুন আজাদ ৯০
অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকারে এই দশকের অন্যতম সাহিত্য-ব্যক্তিত্ব হুমায়ুন আজাদ ৯৮
আমার ব্যর্থতা সম্ভবত এই যে আমি সাধারণত ব্যর্থ হই না ১০৬
বাঙালিকে আমি সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিতে চাই ১১১

প্রবচনবিতর্ক

পক্ষে বিপক্ষে তুমুল লেখালেখি

ড. হুমায়ুন আজাদ এ-সময়ে সবচেয়ে বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। তাঁকে উপেক্ষা করা অসম্ভব। ইতিমধ্যে নজরুল ইসলাম বিষয়ক এক প্রবন্ধে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তা নিয়ে দেশব্যাপী তুমুল হইচই হয়েছে। স্বয়ং রাষ্ট্রপতি এই বিতর্কে অংশ নিয়েছেন। বস্তুতঃ মেধাবী এ-অধ্যাপকের বিবৃতি-ভাষণ-কবিতা সব সময়ই পাঠককে আলোড়িত করে, সে পক্ষেই হোক বিপক্ষেই হোক। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের তরুণদের উদ্যোগে একটি সংকলন প্রকাশিত হয়। অরুণিমা নামের এ-সংকলনটিতে পঁচিশটি 'প্রবচন' সংকলিত হয়। বাঙলা সাহিত্যে কোনো একক ব্যক্তিত্বের সৃষ্ট প্রবচন সম্ভবত আঙ্গিকগত বিচারে এই প্রথম। এ-প্রবচনগুলো সম্পর্কে ঢাকায় তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। বিতর্কের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট লেখক সৈয়দ শামসুল হক। ... গত ১৬.৬.৮৯ তারিখে আমরা ড. হুমায়ুন আজাদের সাথে যোগাযোগ করি। তিনি আমাদের সাথে একটি সাক্ষাৎকার প্রদানসহ আরো নতুন ২৫টি প্রবচন মুদ্রণের জন্যে দেন। আমরা চাই প্রবচন বিতর্কের মধ্য থেকে সাহিত্য বিচারের মানদণ্ড সম্পর্কে কিছু সত্য কথা বেরিয়ে আসুক। পরস্পরের নাক কান না কেটেও সত্যিকারের বিতর্ক সৃষ্টি করা যায় এবং এটা খুবই স্বাস্থ্যকর সাহিত্য ও সমাজের জন্যে এই আমরা এ-প্রতিবেদনটি পরিকল্পনা করেছি।

দর্পণ : আপনি যে প্রবচনগুলো লিখেছেন সে সম্পর্কে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। পক্ষে বিপক্ষে বেশ আলোচনা হচ্ছে, এ সম্পর্কে আপনার প্রতিক্রিয়া কি?

হুমায়ুন আজাদ : (কিছুক্ষণ চুপ থেকে) প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে না বলে বলা ভালো সৃষ্টি করা হয়েছে। (কিছুক্ষণ চুপ থেকে) আপনি কি লিখবেন...?

দর্পণ : না, আপনি বলুন, পরে আমি তা ক্যাসেট থেকে লিখে নেবো।

হুমায়ুন আজাদ : (কিছুক্ষণ নীরব থেকে) আমার এ-প্রবচনগুলো-বলা যেতে পারে বাঙলা ভাষায় এই প্রথম সাহিত্যিক প্রবচন রচনার সূত্রপাত। এখানে আমি বেশ কিছু সমকালীন এবং শাশ্বত সত্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এগুলো শ্লেষ, বিদ্রূপ, হাস্যরসের মধ্য দিয়ে বস্তুজগৎ সম্পর্কে আমার কিছু উপলব্ধির প্রকাশ।

এখানে ব্যক্তিগতভাবে কাউকে আক্রমণও করা হয় নি, কাউকে প্রশংসাও করা হয় নি। কিন্তু যে-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা হয়েছে তা আমার কাছে সাহিত্যিক বা শৈল্পিক বা মননশীল ব'লে মনে হয় নি; বরং মনে হয় এর পেছনে শুধু আমার বিরোধিতা করার প্রবণতাটিই প্রধান।

দর্পণ : প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রথম যে-লেখাটি এসেছে সেটি দৈনিক সংবাদের সাহিত্য পাতায় হৃৎকলমের টানে কলামে সৈয়দ শামসুল হক-এর একটি প্রতিবাদ, লেখাটি কি আপনি পড়েছেন?

হুমায়ুন আজাদ : আমি পড়েছি।

দর্পণ : সৈয়দ হক-এর ব্যাখ্যা যথার্থ হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

হুমায়ুন আজাদ : সৈয়দ হকের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণরূপে অপব্যাখা, তাঁর এ-ধরনের ব্যাখ্যা এক ধরনের আত্মহত্যাও বটে। তিনি তাঁর সাহিত্যে যেভাবে এ-বিষয়গুলো দেখেছেন এখানে তিনি তাঁর সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেছেন। কিছু দিন আগে একটি মৌলবাদী পত্রিকা তাঁকে যেভাবে আক্রমণ করেছে, তিনি তাঁর কলামে আমাকে অবিকল সে-মৌলবাদী পত্রিকার কলাম লেখকের মতো আক্রমণ করেছেন। অর্থাৎ সৈয়দ হকের সঙ্গে ওই মৌলবাদী পত্রিকার লেখকের কোনো পার্থক্য নেই এখন। ফলে এটি আমার বিরুদ্ধে যতোটা আক্রমণ তার চেয়ে তাঁর নিজের বিরুদ্ধে, তাঁর বিশ্বাস, তাঁর সমস্ত সাহিত্যের বিরুদ্ধে অনেক বেশি আক্রমণ। সৈয়দ হক বেশ অসৎ কাজ করেছেন। আমার একটি প্রবচন তার কাজটি সম্পর্কে প্রয়োগ করা যেতে পারে; সৈয়দ হক হয়তো ভাবছেন যে তিনি 'সত্য' কথা বলার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তিনি যে সত্য কথা বলার চেষ্টা করলেন, এতেই বোঝা যায় এর পেছনে তাঁর একটি অসৎ উদ্দেশ্য রয়েছে, যা সাধারণত থাকে বাঙালির। হয়তো তিনি কোনো কারণে আমার প্রতি বিরূপ; এ-কলামের মধ্য দিয়ে আমাকে আক্রমণ করে কিছুটা তৃপ্তি বোধ করছেন। তিনি বুঝতেই পারছেন না এ-আক্রমণ আসলে তাঁর নিজের বিরুদ্ধে, আধুনিকতার বিরুদ্ধে। এতে সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হবে, উপকৃত হবে মৌলবাদীরা, প্রগতিবিরোধীরা। সৈয়দ শামসুল হকও হয়তো নিজে উপকৃত হবেন; কিন্তু এ-উপকার প্রগতি ও আধুনিকতার বিরুদ্ধে যাবে।

দর্পণ : সৈয়দ হক আপনার 'আগে কাননবালারা আসতো পতিতালয় থেকে এখন আসে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে' প্রবচনটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন...

হুমায়ুন আজাদ : এ-প্রবচনটির (কিছুক্ষণ চুপ থেকে) যে-ব্যাখ্যা সৈয়দ হক দিয়েছেন, তাতে একটি অত্যন্ত সুচিন্তিত অপব্যাখ্যা। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের বিরুদ্ধে কোনো আক্রমণ নেই। আমি যা বলেছি তা একটি সামাজিক সত্য। এখানে বলা হয়েছে আগে কাননবালারা আসতো পতিতালয় থেকে এখন আসে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। আমি জানি না সৈয়দ হক 'কাননবালা' শব্দের অর্থ বুঝতে পেরেছেন কিনা। আমার সাথে অনেকেই দেখা করতে এসেছেন, যাঁরা

'কাননবালা' শব্দের তাৎপর্য বুঝতে পারেন নি। কাননবালা বাঙলা চলচ্চিত্রের একজন অত্যন্ত আকর্ষণীয় অভিনেত্রী ছিলেন। আগে বাঙলা নাটক, মঞ্চ, চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্যে মেয়েরা পতিতালয় থেকেই আসতো। কয়েক দশকে আমাদের সমাজে বদল ঘটে গেছে। এখন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, কলেজ থেকে, বহু মেয়ে অভিনয়ে আসছে; একে খুব গৌরবজনক মনে করছে। এ-প্রবচনটির অবশ্য দু-ধরনের ব্যাখ্যা সম্ভব; একটি ইতিবাচক— যে হ্যাঁ, আমাদের সমাজের উন্নতি হয়েছে। সিনেমা বা নাটকের যে-এলাকটি নিন্দিত ছিলো, এককালে অন্ধকার এলাকা বলে মনে করা হতো, সে-এলাকায় এখন শিক্ষিত মেয়েরা আসছে। শিক্ষিত তরুণীরা আসছে ব'লে এর উন্নতি হয়েছে। এর নেতিবাচক ব্যাখ্যা সম্ভব; তা হচ্ছে আগে যে-এলাকায় উচ্চশিক্ষিত মার্জিতরা আসতো না সেখানে এখন বিপুল পরিমাণে উচ্চশিক্ষিত মেয়ে আসছে। এটা আমাদের সমাজের এক ধরনের পতনও নির্দেশ করে। যে-মেয়েটি পদার্থবিজ্ঞানে এমএসসি পাস করেছে, তার কাছে আমি কখনোই প্রত্যাশা করি না সে অভিনেত্রী হবে। যে-মেয়েটি ইংরেজি সাহিত্যে এমএ পাস করেছে আমি মনে করি না সে অভিনেত্রী হবে। এখন দেখা যায় উচ্চ ডিগ্রি নিয়ে অনেক মেয়ে সিনেমায় নামে এবং যে-নায়িকারা শিক্ষিত নয় তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রে ব্যর্থ হয়। তারা ভালো কাননবালাও হ'তে পারে না। এখনকার শিক্ষিত মেয়েরা অঞ্জু ঘোষ হ'তে চায়, তাদের জীবনের লক্ষ্য অঞ্জু ঘোষ হওয়া, শ্রীদেবী হওয়া। কেউ আর বেগম রোকেয়া হতে চায় না। আমাদের সমাজ এদেরই প্রচার বেশি দিয়ে থাকে। যে-তরুণীটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করেছে, যে গবেষণা করতে চায়, যে অত্যন্ত ভালো কাজ করতে চায়, সমাজ তার দিকে ফিরেও তাকায় না; বরং যে সিনেমায় নেমেছে, নাটকে নেমেছে, তার ছবি ছাপা হয়, তাকে অসাধারণ বলে নির্দেশ করা হয়। এটা সমাজের পতন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমি শুনেছি বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকায় অভিনেত্রীর বেশ মূল্য। কিন্তু যে মেয়েটি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছে, চমৎকার গবেষণা করেছে, চমৎকার বই লিখেছে, তাকে বিশেষ মূল্য দেয়া হয় না। প্রবচনটিতে এ-দুটো দিকই ধরা পড়েছে। এটি কোনো ব্যক্তি বা নারী সমাজের প্রতি আক্রমণ নয়, বিষোদগার নয়, এটি একটি সত্যের প্রকাশ; এবং (একটু হেসে) ব্যক্তিগতভাবে আমি নারীবাদী আন্দোলনের একজন বড়ো প্রবক্তা, যা সৈয়দ হক সম্ভবত নন।

দর্পণ : আচ্ছা, আর একটি প্রবচন নিয়ে কথা বলেছেন সৈয়দ হক, যেটি হলো 'শামসুর রাহমানকে একজন অভিনেত্রীর সাথে টিভিতে দেখা গেল, শামসুর রাহমান বোঝেন না কার সঙ্গে পর্দায় যেতে হয়, কার সঙ্গে শয্যায় যেতে হয়।' এ প্রবচনটি উদ্ধৃত ক'রে তিনি বলেছেন, আপনি শামসুর রাহমানের অভিভাবক নন, আপনি এ ধরনের কমেন্ট কিভাবে করলেন?

হুমায়ুন আজাদ : এ-প্রবচনটি সম্পর্কে মন্তব্য করার আগে সৈয়দ হকের সমস্ত

ব্যাখ্যা সম্পর্কে কিছু কথা বলতে চাই। সৈয়দ হক বারবার শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধার কথা বলেছেন। আমি বুঝি না একজন আধুনিক মানুষ সারাক্ষণ শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধার কথা কেনো ভাবেন। হয়তো সৈয়দ হক নিজেকে শ্রদ্ধেয় ভাবতে পারছেন না, বা যথেষ্ট শ্রদ্ধা পাচ্ছেন না বলে তার এ রকম মনে হচ্ছে। শামসুর রাহমান ও একজন অভিনেত্রী সম্পর্কে আমি যে-মন্তব্য করেছি তার বক্তব্যটা আগে লক্ষ করা যাক। শামসুর রাহমান বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান কবি; তাই তাঁর প্রতীকী তাৎপর্য আছে। তিনি একটি অভিনেত্রীর সঙ্গে কী কথা বলতে পারেন? অভিনেত্রীর সঙ্গে কী কথা বলা যেতে পারে? তার সঙ্গে নিশ্চয়ই বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কে, দর্শন সম্পর্কে, সমাজ সম্পর্কে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তার সাথে শুধু চাটনি, লিপিস্টিক ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা সম্ভব, ফাজলামো করা সম্ভব। শামসুর রাহমান সেখানে কেনো যাবেন ফাজলামো করতে? আমি কেনো যাবো?

দর্পণ : শয্যা ব্যাপারটি তাহলে প্রতীকী অর্থে এসেছে...

হুমায়ুন আজাদ : এর মধ্যে একটি হিউমার রয়েছে। সারা পৃথিবীতে অভিনেত্রীদের কীভাবে দেখা হয়? সারা পৃথিবীতে অভিনেত্রীরা মোটামুটিভাবে যৌনাবেদনময়ী নারী। তারা মনহীন দেহসর্বস্ব মানুষ মাত্র। কাজেই তাঁর সঙ্গে অভিনেত্রীর কথা আমি ভাবতে পারি না। মনে করুন রবীন্দ্রনাথ একজন অভিনেত্রীর সঙ্গে টেলিভিশনের পর্দায় দর্শকদের চিত্তবিনোদনের জন্যে গেছেন। এ আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। অভিভাবকত্বের কোনো ব্যাপারই নেই এখানে। আমি বিশ্বের যে-কোনো বিষয় সম্পর্কে কথা বলতে পারি, শামসুর রাহমান কেনো, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও পারি, শেক্সপিয়র সম্পর্কেও পারি। রবীন্দ্রনাথের বহু ব্যাপার আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন রবীন্দ্রনাথ বহু পণ্যের বিজ্ঞাপনে নিজেকে বেচেছেন, যা আমি সমর্থন করি না। নিজেকে তিনি পণ্যসামগ্রী করে তুলেছিলেন।

দর্পণ : আরেকটি প্রবচন সৈয়দ হক উদ্ধৃত করেছেন, সেটি হচ্ছে— অধিকাংশ

রূপসীর হাসির সৌন্দর্য মাংসপেশির কৃতিত্ব মাত্র, তা হৃদয়ের প্রকাশ নয়। এর মধ্য দিয়ে তিনি বলতে চেয়েছেন যে, আপনি এখানেও নারীকে অবজ্ঞা করেছেন, নারীকে ছোট করে দেখেছেন।

হুমায়ুন আজাদ : সৈয়দ হকের মগজ যে এতো নিষ্ক্রিয় এটা ভাবতে আমার কষ্ট হয়। নারীকে যে সারাক্ষণ প্রশংসা করতে হবে তা নয়; কেউই সারাক্ষণ প্রশংসা পেতে পারে না, নারী হওয়া সহজাতভাবে প্রশংসা পাওয়ার ব্যাপার নয়; সব কিছুই সমালোচনার বস্তু। এখানে আমি অধিকাংশ রূপসীর কথা বলেছি। এটা তো ঠিক যে শারীরিক সৌন্দর্য, হাসির যে-সৌন্দর্য, তা প্রধানত হচ্ছে পেশির সৌন্দর্য; অবয়বসংস্থানের সৌন্দর্য। কে না জানে যে রূপসীদের হাসির বড়ো অংশই কৃত্রিম, তার পেছনে রয়েছে কতো ব্যায়াম। এখানে সমস্ত নারীর কথা বলা হয় নি; বলা হয়েছে অধিকাংশ রূপসীর কথা। এ-সমাজে আর সারা পৃথিবীতে রূপসী বলে সাধারণত গণ্য হয় যারা, সে-চিত্রতারকা বা সামাজিক মহিলাদের আন্তরিকতা নেই; তা পণ্যমাত্র। এটা মাংসপেশির কাজ, যার মাংসপেশি সুন্দর তার হাসিও সুন্দর। এ-প্রবচনটি আমার কাছে বেশ আকর্ষণীয় বলে মনে হয়।

দর্পণ : আর একটি প্রবচন, সেটি হচ্ছে 'একটি স্থাপত্য কর্ম সম্পর্কে আমার কোনো আপত্তি নেই এবং তার কোনো সংস্কারও আমি অনুমোদন করি না, স্থাপত্য কর্মটি হচ্ছে নারীদেহ।' সৈয়দ হক প্রবচনটি তুলে ধরে বলেছেন যে নারীকে আপনি 'শরীর, শরীর এবং শরীর' এরকমভাবে মূল্যায়ন করেন।

হুমায়ুন আজাদ : এখানে নারীর একটি দিক সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে। আমি কোথাও বলি নি যে নারীর শরীর ছাড়া আর কিছু নেই। ভাস্কর্য শরীরেই হয়ে থাকে, কখনো মনের ভাস্কর্য রচিত হয়নি। এটি নারীসৌন্দর্যের এক অসাধারণ স্বীকৃতি। আমি সমস্ত কিছুকে সংস্কারযোগ্য মনে করি, শুধু নারীর অবয়বসংস্থানকে বা সুষমাকে আমার আর সংস্কারযোগ্য মনে হয় না। সারাক্ষণ শুধু মনের কথাই বলতে হবে, এটা কোনো কাজের কথা নয়। রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন, নারীকে নিয়ে একটি অসুবিধা এই যে তাকে যদি বলা হয় তুমি দেখতে সুন্দর, তখন সে ক্ষুণ্ন হয় এ কথা ভেবে যে তার মনটাকে মূল্য দেয়া হচ্ছে না; আবার যদি বলা হয় তোমার মনটি সুন্দর, তখন সে ক্ষুণ্ন হয় এ ভেবে যে তাকে বোধ হয় রূপসী মনে করা হচ্ছে না। (প্রাণখোলা হাসি) এই যে... এখানে নারীর যে মন রয়েছে, নারী কেন সবারই মন রয়েছে, সে সম্পর্কে কোনো কথাই বলা হয়নি। আমরা অবয়বের প্রশংসা করতে পারবো না? এখানে অবয়বেরই প্রশংসা করা হয়েছে। সৈয়দ হকের এ-আলোচনা অত্যন্ত অসৎ, অত্যন্ত অসৎ। তাঁর সমস্ত ব্যাখ্যাই অসৎ। তিনি নিজে নারীদেহকে নানাভাবে পীড়ন করেছেন তাঁর লেখায়, এখন তিনি কপটভাবে নিয়েছেন নারীর পক্ষ। তিনি যে কয়েকটি প্রবচন আলোচনা বা অপব্যাখ্যা করেছেন সেগুলোই সব নয়। এর বাইরেও অনেক

প্রবচন ছিলো, যেগুলো নানাভাবে আকর্ষণীয়, তাৎপর্যপূর্ণ এবং সমকালের বহু কিছু ব্যাখ্যা করে; তিনি সেগুলোর কথা বলেন নি।

দর্পণ : আরেকটি প্রবচন 'মানুষ সিংহের প্রশংসা করে, আসলে গাধাকে পছন্দ করে।' এই প্রবচনটি উদ্ধৃত করে সৈয়দ হক বলেছেন আপনি যাদেরকে পছন্দ করেন তাদেরকে কি গাধা মনে করেন?

হুমায়ুন আজাদ : না , আমি যাদের পছন্দ করি তাদের গাধা মনে করি না। সৈয়দ হককেও আমি পছন্দ করি। তিনি কি ভাবেন তাঁকে আমি গাধা মনে করি? আজকাল সমাজের বিভিন্ন জায়গা যারা অধিকার করে আছে তারা সাধারণত অযোগ্যদের পছন্দ করে, তারা প্রতিভাবানদের দু-একটি প্রশংসা করে অযোগ্যদের বসায় বিভিন্ন স্থানে। এটা আমার একটি ছোটো কবিতার অংশ। আমার একটি কবিতা আছে এ-রকমের : 'মানুষ সিংহের প্রশংসা করে,/কিন্তু আসলে গাধাকেই পছন্দ করে,/আমার প্রতিভাকে প্রশংসা করলেও,/আসলে ওই পুঁজিপতি গাধাটিকেই পছন্দ করো তুমি।' (প্রাণ খোলা হাসি) এটি কবিতার একটি লাইন। দেখা যাবে কোনো তরুণী কোনো প্রতিভাবান তরুণের প্রশংসা করছে, কিন্তু পছন্দ করছে একটি নির্বোধ ধনীর পুত্রকে, শেষ পর্যন্ত বিয়ে করছে ওই ধনীর পুত্রটিকেই।

দর্পণ : আর একটি প্রবচন সৈয়দ হক উদ্ধৃত করেছেন— 'শ্রদ্ধা হচ্ছে শক্তিমান কারো সাহায্যে স্বার্থ উদ্ধারের পারিশ্রমিক।' এবং তিনি এ প্রবচনটি উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, আপনিও পারিশ্রমিক পেয়েছেন কিনা শামসুর রাহমান-এর ওপর লিখে?

হুমায়ুন আজাদ : পেয়েছি কিনা এটা সৈয়দ হক শামসুর রাহমানের কাছে গিয়ে জেনে আসতে পারেন। (কিছুক্ষণ চুপ থেকে) সৈয়দ হক যে এতো রসবোধহীন মানুষ এটা আমার জানা ছিলো না। এটা আমার কাছে শ্রদ্ধার একটি বেশ চমৎকার সমকালীন সংজ্ঞা বলে মনে হয়। চারপাশে যদি আমরা চোখ মেলে দেখি তাহলে দেখা যাবে যে যাকে শ্রদ্ধা বলছি সে-শ্রদ্ধার সঙ্গে কিছু না কিছু স্বার্থ জড়িত আছে। কোনো রকম স্বার্থহীন শ্রদ্ধা কি এখন পাওয়া যায়? এখন তো অনেকেই নিয়মিতভাবে গুরু পরিবর্তন করে থাকে। এখন স্বার্থই বড়ো কথা। এটি যদি আমার কথা না হয়ে অন্য কোনো লেখকের মন্তব্য হতো, বা রবীন্দ্রনাথের হতো, তাহলে এটি খুবই প্রশংসিত হতো। এখানে এটি বিপরীত দৃষ্টিকোণ থেকে 'শ্রদ্ধা'র একটি সংজ্ঞা তৈরি করা হয়েছে। এ-জিনিস যিনি বুঝবেন না তাঁকে এটি বোঝানো বাতুলতা। সৈয়দ শামসুল হক সম্পর্কে আমি খুবই উদ্বিগ্ন, তাঁর মগজে বোধ হয় কিছুটা পচন ধরেছে।

দর্পণ : সৈয়দ হক আপনার মধ্যে মৌলিক মূর্খতা খুঁজে পেয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন...

হুমায়ুন আজাদ : এককালে চমকপ্রদ এক ব্যাপার ছিলো কারো কথা তাকে ফিরিয়ে দেয়া, তখন এটা বেশ আকর্ষণীয় ব্যাপার বলে গণ্য হতো। এখন কারো কথা তাকে ফিরিয়ে দেয়াটা হাস্যকর, অনাধুনিকতা এবং মগজহীনতার লক্ষণ। আমার নয়, বরং সৈয়দ শামসুল হকের মগজহীনতা ও গৌণতা অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি এখন এতো গৌণ যে একটি চমৎকার কথা সৃষ্টি করে আমাকে আক্রমণ করার মতো চিন্তাভাবনা এবং বাক্য তাঁর নেই, তাই আমার বাক্যই ব্যবহার করেছেন আমাকে আঘাত করার জন্যে।

দর্পণ : এ প্রসঙ্গে জানতে চাইবো সৈয়দ হক যে কমেন্টগুলো করেছেন তার সাথে তাঁর সাহিত্যকর্মের বা লেখার সাথে কোনো সামঞ্জস্য পাওয়া যায়? সৈয়দ হকের রচনাকর্ম যদি আপনি পড়ে থাকেন তাহলে এর ভিত্তিতে কিছু বলুন।

হুমায়ুন আজাদ : সৈয়দ হকের মন্তব্যগুলো, আমি আগেই বলেছি, সম্পূর্ণ আত্মঘাতী। তিনি অনেকটা নিজেকেই নিজে আক্রমণ করেছেন। কারণ তাঁর উপন্যাস, কবিতা, নাটকের মধ্যে আমরা যে দৃষ্টিভঙ্গি পাই, তাঁর কলামের দৃষ্টিকোণ তার সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে তিনি একটি মৌলবাদী প্রতিক্রিয়াশীলের ভূমিকা নিয়েছেন। আমি জানি না তিনি ক্রমশ মৌলবাদী থেকে আরো মৌলবাদী হবেন কিনা। যদি তিনি তা হতে থাকেন তাহলে তাঁর কলামটি সংগ্রাম বা ইনকিলাবে ছাপা হওয়াই ভালো। তিনি জামায়াত ধরনের কোনো রাজনৈতিক দলে যোগ দিতে পারেন, তাতে তাঁকে ভালো মানাবে।

দর্পণ : সৈয়দ হকের বেশ কটি উপন্যাস নরনারী সম্পর্কসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেক্ষিত এসেছে এ সম্পর্কে আপনার জানা আছে?

হুমায়ুন আজাদ : কিছু পড়া আছে। সৈয়দ হকের অনেক উপন্যাস মূলত পর্নোগ্রাফি। মুক্তিযুদ্ধের যে-উপন্যাসগুলো তিনি লিখেছেন সেগুলোকেও তিনি ধর্ষণের উপাখ্যানে পরিণত করেছেন। তাঁর লেখা খেলারাম খেলে যা নামের যৌন অপন্যাসটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি মেয়েকে বারবার ভোগ করা হয়েছে। তিনি একজন ভালো পর্নোঅপন্যাসিক। তাঁর দূরত্ব উপন্যাসে কলাভবনের ছাদে 'রাজা' পাওয়া যায় ব'লে উল্লেখ আছে।

দর্পণ : প্রসঙ্গত ডি এইচ লরেন্সের কথা বলা যায়, তিনিও তো বর্ণনার ব্যাপারে খোলাখুলি ছিলেন।

হুমায়ুন আজাদ : কোথায় ডি এইচ লরেন্স আর কোথায় সৈয়দ শামসুল হক, দুজনের তুলনা করা হাস্যকর।

দর্পণ : আমরা এখন আর সৈয়দ হক সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই না। আপনার প্রবচনগুলো প্রকাশ করার পর যে পত্রিকাগুলো এ নিয়ে লেখালেখি করেছে তার একটির প্রতিবেদনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান, ভিসি এবং কয়েকটি হলের ছাত্রী সংসদের নেত্রীর বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেছে। আপনি কি সেই পত্রিকাটি পড়েছেন?

হুমায়ুন আজাদ : হ্যাঁ, আমি পড়েছি।

দর্পণ : এ প্রসঙ্গে তাদের মন্তব্য সম্পর্কে কি আপনার বলার কিছু আছে?

হুমায়ুন আজাদ : প্রথমে বিচিত্রার ভূমিকাটি বিবেচনা করা যাক। বিচিত্রার প্রতিবেদনটি পড়ে মনে হয়েছে এটি কোনো সাহিত্যিক বা শৈল্পিক আলোচনা নয়; এটি দুরভিসন্ধিমূলক। বিচিত্রার সঙ্গে আমার সম্পর্ক জানলে বোঝা যাবে তারা এ কাজ কেনো করেছে? তারা আমাকে আক্রমণ করেছে, তার কারণ হচ্ছে শামসুর রাহমানকে নিয়ে যখন দৈনিক বাংলা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আন্দোলন করা হয়েছিলো, তাতে আমি প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলাম। আমরা বিচিত্রা, দৈনিক বাংলায় কখনো লিখবো না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম; পরে অনেকে সে-সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করেছে, কিন্তু আমি কখনো সে-সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসি নি। তাই বিচিত্রা আমার ওপর ক্ষিপ্ত। এ-পত্রিকার একব্যক্তি আমার সাথে বেয়াদবির কারণে কয়েক মাস চাকরিচ্যুত ছিলেন। এটা তাঁর এবং তাঁর সঙ্গীদের কাজ ব'লে মনে করি। বিচিত্রা, দৈনিক বাংলা স্বৈরাচারের পক্ষে, আমি স্বৈরাচারের বিপক্ষে; তাই তারা আমার বিরুদ্ধে একটি উদ্যোগ নিয়েছে। (কিছুক্ষণ থেমে) এখানে যে-কটি সাক্ষাৎকার বেরিয়েছে, তার মধ্যে বাংলা বিভাগের সভাপতি আবুল কালাম মঞ্জুর মোর্শেদ আমাকে বলেছিলেন যে ওসব তিনি বলেন নি। অন্য সাক্ষাৎকার সম্পর্কে আমি কিছু জানি না। উপাচার্যের নামে যে-উক্তিটি আছে আমি আশা করি তিনি তা

বলেন নি। কোনো দায়িত্বশীল মানুষ এমন দায়িত্বহীন কথা বলতে পারেন না। শিক্ষক সমিতির সভাপতির উক্তিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন ও শিক্ষকদের লেখার স্বাধীনতার বিরোধী। এ-উক্তিটি আশা করি তিনি প্রত্যাহার করবেন, নইলে স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে কোনো কথা বলার অধিকার তাঁর থাকবে না।

দর্পণ : আমরা এ সম্পর্কে আর কথা বলবো না। প্রবচনগুলোর শিল্পমূল্য সম্পর্কে আপনার ধারণা জানতে চাই। আপনি বলেছেন এই ধরনের প্রবচন বাঙলা সাহিত্যে এই প্রথম। প্রথমে আমি জানতে চাচ্ছি যে বিশ্বসাহিত্যে এ ধরনের প্রবচন লেখার কোনো প্রবণতা আছে কিনা? এবং আপনি এখনও কীভাবে এ-প্রবচনগুলো লেখার সিদ্ধান্ত নিলেন?

হুমায়ুন আজাদ : ফরাশি লেখকেরা প্রবচন রচনায় বিশেষ উৎসাহী ও সফল। ইংরেজ লেখকরাও প্রচুর প্রবচন রচনা করেছেন। বাঙলায় যে প্রবচন নেই তা নয়, আমাদের লৌকিক প্রবচন বেশ সমৃদ্ধ। (প্রাণখোলা হাসি) আমার এ-প্রবচন কটিকে বলতে পারি সাহিত্যিক প্রবচন; সচেতনভাবে প্রবচন রচনার এটিই সম্ভবত প্রথম প্রয়াস। তবে আমি নিজেকে প্রথম বলে গণ্য করি না; আমাদের প্রধান লেখকদের রচনাবলিতে প্রচুর প্রবচনের সন্ধান পাই, যদিও তারা সেগুলোকে এক দুই তিন করে বিন্যস্ত করেন নি।

আমরা শুধু প্রবচন রচনা করতে পারি বিশাল প্রবন্ধ রচনা না ক'রে। আমাদের বিভিন্ন উপলব্ধি, ব্যাখ্যা, আবেগ ইত্যাদি আমরা সংহত আকারে প্রকাশ করতে পারি। প্রবচন রচনার পেছনে যা কাজ করেছে তা হচ্ছে আমার শ্লেষ, বিদ্রূপ এবং গভীর সত্য প্রকাশ করার প্রবণতা। আমি দৈনন্দিন জীবনেও তা করে থাকি। এমন কোনো এলাকা নেই যে-এলাকা সম্পর্কে আমার কোনো মন্তব্য নেই। সেজন্য আমি মন্তব্যগুলো লেখার কথা ভাবি; আমার এক ছাত্রকে আমি এগুলো প্রকাশের জন্য দেই। আমি জানতাম না যে এগুলো নিয়ে এমন আলোড়ন হবে।

দর্পণ : মনে করা হয় প্রবচন হাজার বছরের মানুষের জীবন উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে বিকশিত হয়, প্রজন্মের পর প্রজন্ম এগুলো ধরে রাখে। অর্থাৎ একজন ব্যক্তি ড. হুমায়ুন আজাদের 'প্রবচন' লেখার কোনো অধিকার নেই...।

হুমায়ুন আজাদ : এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। যে কোনো আঙ্গিকে লেখার অধিকার আমার আছে। যারা এসব কথা বলেন তাদের জন্য আমার দুঃখ হয়।

দর্পণ : আমাকে একজন বিশিষ্ট লেখক বলেছেন যে কিছু প্রবচন নাকি আপনার নিজের নয়। এগুলো আপনি আত্মসাৎ করেছেন। পুঁজিবাদী ঈশ্বরের নাম টাকা এবং মন্দিরের নাম ব্যাংক, এ কথাটি নাকি বোদলেয়রের?

হুমায়ুন আজাদ : কে ওই বিশিষ্ট লেখক? আমি সচেতনভাবে কারো উক্তি গ্রহণ করি নি। বোদলেয়রের এমন কোনো উক্তির কথা আমার জানা নেই; যদি

বোদলেয়র এমন কথা বলে থাকেন তাহলে আমি আনন্দিত এজন্যে যে তাঁর সাথে আমার চিন্তার মিল রয়েছে।

দর্পণ : আপনার সম্পর্কে কেউ কেউ বলে থাকেন— আপনি মূলত চমক সৃষ্টি করে বিতর্কিত হবার জন্য সময়ে সময়ে চটকদার কথাবার্তা বলে থাকেন। অষ্টপ্রহর একজন বিতর্কিত ব্যক্তি হয়ে থাকতেই নাকি আপনার সমূহ আনন্দ?

হুমায়ুন আজাদ : আমি বিতর্কিত হতে চাই এটা ঠিক নয়। আমাদের সমাজ এতোই সংকীর্ণ যে এখানে যে কোনো সত্য কথাই বিতর্ক সৃষ্টি করে। আমার লেখায় প্রথাবিরোধী কিছু মর্মান্তিক সত্য থাকে, তাই বিতর্ক সৃষ্টি করে। আমি কোনো প্রথাকেই বিনা প্রশ্নে মেনে নিই না। যাঁরা এ-ধরনের কথা বলেন আমি চাই তাঁরা কিছু চমকপ্রদ কথা বলে বিতর্ক সৃষ্টি করুন। দেখবেন তাঁদের কতো স্বার্থ বিপন্ন হয়ে পড়ে।

দর্পণ : আপনি ইচ্ছে করে বিতর্কিত হতে চান, এ রকম অভিযোগ যাদের তাঁদের অনেকে কবিতা পরিষদের প্রবন্ধ পাঠের বিষয়টি টেনে আনেন। আপনি নাকি বিতর্কিত অংশ পড়বেন না এমন কথা দিয়ে ছিলেন কবিতা পরিষদকে, কিন্তু মঞ্চে উঠে কথা রাখেন নি; তাই গণ্ডগোল লেগে যায়...।

হুমায়ুন আজাদ : যারা এ কথা বলে তারা পুরোপুরি মিথ্যেবাদী। ঘটনা হচ্ছে আমার প্রবন্ধের প্রথম খসড়ার এক জায়গায় প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবে কয়েকজনের নাম ছিলো। প্রবন্ধটি যখন কবিতা পরিষদের একটি সভায় আলোচিত হয়, তখন কেউ কেউ তালিকা থেকে কয়েকজনের নাম বাদ দিতে বলেন, তাঁদের প্রতিক্রিয়াশীল বলা যাবে না; কারণ তাঁরা তাঁদের বন্ধু। সেজন্য আমি বলি যে ওই তালিকাটি অপরিহার্য নয়, তাই ওই নামগুলো বাদ যেতে পারে। আমার প্রবন্ধের যে-কোনো অংশ যে-কোনো মুহূর্তে বাদ দেয়ার অধিকার আমার আছে। আর একটি অংশে ষাটের দশকের কয়েকজন গৌণ কবির নাম ছিলো। আমি সে-নামগুলোও বাদ দিই। কিন্তু তাঁরা আমার মুখে মঞ্চ থেকে তাঁদের নাম শুনতে চায়। তাদের দুঃখ এতো হইচই করেও কবি হিশেবে তাঁরা আমার স্বীকৃতি পেলেন না। এজন্যই তাঁরা এসব মিথ্যে রটনা করে ফেলেন।

দর্পণ : কবিতা পরিষদে আপনি ছিলেন। শেষে আপনি কবিতা পরিষদ ছেড়ে চলে এসেছেন। কবিতা পরিষদের ভূমিকা, বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

হুমায়ুন আজাদ : কবিতা পরিষদ সম্পর্কে অন্তত দু-তিন জায়গায় আমি মন্তব্য করেছি। এখন মন্তব্য করতেও আমার খারাপ লাগে।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন : সরকার আমিন
বিশ্বদর্পণ : ২১-২৭শে জুন, ১৯৮৯; ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা

বাংলাদেশের সাহিত্য খুব একটা উঁচু মানের নয়

তাঁকে স্বীকার করতে হবে, নইলে অস্বীকার; কিন্তু উপেক্ষা করা যাবে না তাঁকে, কিছুতেই হুমায়ুন আজাদ। কবি। ভাষাবিজ্ঞানী তিনি, গবেষক। বিভিন্ন সাময়িকপত্রে তাঁর কলামগুলোও বিচলিত করে মানুষকে, করে নিমজ্জিত কিংবা উদ্বুদ্ধ। বহু ভারী ভারী গ্রন্থের লেখক হুমায়ুন আজাদ। তবু শেষ পর্যন্ত কবিই। এ-সাক্ষাৎকারটি, যা নেয়া হয়েছে ১০ মার্চে (১৯৯২), জীবনের বিচিত্র বিষয় নিয়ে হুমায়ুন আজাদের চিন্তাভাবনাকে বুঝতে সাহায্য করবে; কেবল তাই নয়, আবারো শোনাবে হুমায়ুন আজাদীয় কণ্ঠস্বর। তবে, এ-দাবি করা যেতে পারে যে, এবারে তাঁর কণ্ঠস্বর অনেক বেশি অন্তরঙ্গ, অনেক বেশি আন্তরিক।

মাসুদুজ্জামান : বোর্হেসকে একজন সাংবাদিক একটা প্রশ্ন করেছিলেন সে-রকম একটা প্রশ্ন দিয়েই শুরু করি। আপনি কী ধরনের স্বপ্ন দেখেন?

হুমায়ুন আজাদ : আমি আজকাল খুব বেশি স্বপ্ন দেখি না; আর বিস্মিত হই যখন স্বপ্ন দেখি, আমি বাল্যকালের একজনকে স্বপ্ন দেখি।

আনিসুল হক : বাল্যকালের কাকে স্বপ্ন দেখেন?

হুমায়ুন আজাদ : এক বান্ধবীকে।

আ. হ. : এতো গেল ঘুমিয়ে যে স্বপ্ন দেখা, এ ছাড়া পৃথিবী নিয়ে সমাজ নিয়ে নিজের কি কোনো স্বপ্ন আছে?

হুমায়ুন আজাদ : সে তো আছেই। এই সমাজের বিপরীতধর্মী এক ধরনের সমাজের স্বপ্ন তো আছেই, যাতে বর্তমান সমাজের শোষণ নেই, আর্থিক কষ্ট নেই এবং পাঁচ হাজার বছর ধরে চলছে যে-সমাজ সে-সমাজ নেই। এ রকম সমাজের কথা তো ভাবিই।

মাসুদ : এই সমাজের একটা রূপরেখা দেবেন?

হুমায়ুন আজাদ : আমি এমন একটি সমাজ চাই, যে-সমাজ, বলা যাক, পশ্চিম ইউরোপি সমাজের চূড়ান্ত রূপ। সমাজতান্ত্রিক সমাজের স্বপ্নে বিভোর আমি নই; আমি চাই সবাই সচ্ছল থাকবে— জ্ঞানচর্চা, আনন্দ, উল্লাস এবং যতো প্রথা রয়েছে সে-সব অতিক্রম করে মানুষ সম্পূর্ণ মানবিক জীবন যাপন করবে।

আ. হ. : তার মানে আপনার স্বপ্ন ইতিবাচক। কিন্তু আপনি আপনার কলামে লেখাগুলোতে যে-স্বপ্না সাধারণত দেখান, সেখানে বলেছেন এখন প্রকৃত আশাবাদীর পক্ষে হতাশ হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

হুমায়ুন আজাদ : আশার কথা বাঙালি যেভাবে বলে আমি অবশ্য সেভাবে বলতে চাই না। বাঙালি নিরর্থক আশাবাদী জাতি। এখানে মানুষ মিথ্যা আশার কথা বলতে আর শুনতে পছন্দ করে। আশাবাদ বাঙালির রোগে পরিণত হয়েছে। চারপাশে যে-সমস্ত আশার কথা রটানো হয়, সেগুলো ভুল আশা, নিরর্থক আশা যা কখনো চরিতার্থ হবে না। সেজন্যই আমি হতাশার কথা বলি, যাতে ওই শিশুসুলভ আশার হাত থেকে আমরা মুক্তি পাই। এছাড়া একটি দার্শনিক কারণও আছে, আশার চেয়ে হতাশা অনেক বেশি গভীর ব্যাপার বলে আমার মনে হয়। মানুষের সমস্ত সৃষ্টি ও সাফল্যের চূড়ান্ত রূপ হচ্ছে ব্যর্থতা, সব কিছুর পরিণাম ধ্বংস হয়ে যাওয়া। কাজেই সমস্ত আশার পেছনে হতাশার কথা মনে পড়ে; এটাকেই আমি দার্শনিক ব্যাপার বলে মনে করি।

আ. হ. : তার মানে আপনার সব কিছু তাহলে শেষ পর্যন্ত নেতিতে শেষ হবে।

হুমায়ুন আজাদ : তার কারণ মানুষ অনন্তকাল ধরে থাকবে না, পৃথিবী অনন্তকাল ধরে থাকবে না; মহাকালের ক্ষুদ্রাংশই মানুষের আয়ু। সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। আশা তাই স্থূল ব্যাপার।

মাসুদ : আপনি তো পশ্চিমের ধরনের সমাজব্যবস্থার সপক্ষে বললেন, তো পশ্চিমের সমাজতো খোলামেলা, যেমন নারীপুরুষের সমানাধিকার ও সহজ সম্পর্কের ভেতর দিয়ে ওরা চলছে, এ ধরনের সমাজ এখানে চালু হবার কথা কেউ বললে আপনি কি তা মেনে নেবেন?

হুমায়ুন আজাদ : আমরা যে সমাজব্যবস্থার মধ্যে আছি তাকে আমার সম্পূর্ণ মধ্যযুগীয় সমাজ বলে মনে হয়। নারীপুরুষের সম্পর্ক এখানে মধ্যযুগীয় চিন্তাধারা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আধুনিক সভ্যতার স্রষ্টা পশ্চিম। ওরা সমাজকে রূপান্তরিত করেছে, রাষ্ট্রকে রূপান্তরিত করেছে এবং ক্রমশ মুক্তির দিকে এগিয়ে গেছে। এখনো ওদের মুক্তি ঘটে নি; আমাদের মুক্তি কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছি, কিন্তু মানসিক স্বাধীনতা অর্জন করি নি। পাশ্চাত্যের সমাজব্যবস্থা যদি এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়, আমি খুশি হবো; কিন্তু তারাই কি ওই সমাজব্যবস্থা এখানে প্রতিষ্ঠিত করে দেবে? আমরা যদি প্রতিষ্ঠিত করি তাহলেই শুধু তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু এটা সম্ভব নয়, প্রধান কারণ আর্থনীতিক। যদি বাংলাদেশ সম্পদশালী দেশ হতো তাহলে পুরুষ এবং নারীর প্রথাগত সম্পর্ক সহজেই বদলে যেতো।

মাসুদ : কিন্তু সমাজে নয়, কেউ যদি ব্যক্তিগত জীবনে মনে করে যে ওই ধরনের জীবনযাপন করবে, ধরা যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের লনে একজোড়া তরুণতরুণী চুমু খেতে চাইছে, প্রকাশ্যে, একে আপনি কি অনুমোদন দেবেন?

হুমায়ুন আজাদ : নারীপুরুষ পরস্পরের প্রতি দারুণ আকর্ষণ অনুভব করে, মিলিত হতে চায়। কিন্তু দুটি বাধা রয়েছে। একটি হচ্ছে সামাজিক-ধর্মীয়। সামাজিক-ধর্মীয় নিষেধ রয়েছে যে প্রকাশ্যে চুমোটুমো চলবে না, তবে প্রধান বাধা অসচ্ছলতার। যদি প্রতিটি তরুণের নিজস্ব নিভৃত কক্ষ থাকতো, প্রতিটি তরুণীর নিজস্ব একটা কক্ষ থাকতো, তাহলে তারা অবাধে মিলিত হতো। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখি তরুণতরুণীরা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে বসে, লুকিয়ে চুমোও খায়। তারা যদি নিজেদের কক্ষ পেতো তারা ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হতো। এটাই স্বাভাবিক; আমি এর পক্ষে, নারীপুরুষের স্বাভাবিক সম্পর্কের পক্ষে। পাশ্চাত্যে ওরা স্বাভাবিক জীবনাচারণ করে, এখানকার মতো বিকারে ভোগে না।

আ. হ. : আপনি কবি হিশেবে ষাটের দশক পর্যন্ত স্বীকৃতি দিয়েছেন কাউকে কাউকে, সত্তর-আশির দশকের কাউকে কি কবি বলে মনে হয় না?

হুমায়ুন আজাদ : সত্তর এবং আশির যারা কবিতা লিখেছেন, তাদের কেউ এখনো 'কবি' নামের উপযুক্ত হয়ে ওঠেন নি।

মাসুদ : সাম্প্রতিক কবিতা মানে একেবারে তরুণদের কবিতা পড়েছেন?

হুমায়ুন আজাদ : পড়েছি। তারা এক ধরনের নতুন কবিতার কথা ভাবছে, লেখারও চেষ্টা করছে; কেউ কেউ তত্ত্বও দিচ্ছে। তাদের তত্ত্ব কিছুটা আকর্ষণ করে, কিন্তু ওই তত্ত্বের সাথে যখন তাদের কবিতা মিলিয়ে পড়ি তখন মনে হয় কবিতা লিখতে পারছে না।

মাসুদ : পশ্চিম বাংলায় কবিতার স্পষ্ট দুটি ভাগ হয়ে গেছে। শক্তি-সুনীল একদিকে, অন্যদিকে জয়-মৃদুল-মল্লিকা-গৌতমদের ধারা। এটা কি মনে হয় না শেষের এরা একটা কিছু দাঁড় করাতে, নতুন কবিতা দিতে পারছে?

হুমায়ুন আজাদ : কবিতা এগিয়ে চলবেই। কবিতার ইতিহাসে দেখা গেছে অত্যন্ত উঁচু কবিতার পর নিচু কবিতার ধারা এসেছে। যেমন তিরিশের কবিতার পর আমরা পেয়েছি চল্লিশের কবিতা, যা বেশ নিম্নমানের। ষাটের দশকে এখানে উল্লেখযোগ্য কবিতা রচিত হয়েছে, তারপর কবিতার মান নেমে গেছে। নতুন কবিতা পাওয়া যাবে, কবিতার মতো রচনাও পাওয়া যাবে; তার মানে এই নয় যে এগুলো অসাধারণ বা গুরুত্বপূর্ণ কবিতা। আমি ওই দু-চারজনের, পশ্চিম বাংলার যে-তরুণ কবিদের কথা বললে পড়ে দেখেছি। ওই কবিতাকে আমার বানানো প্রলাপ মনে হয়েছে, প্রলাপকে-বানানো প্রলাপকে আমি কবিতা মনে করি না। তার নাম সম্ভবত জয় গোস্বামী, তার কবিতা হচ্ছে হাস্যকর প্রলাপ, অনেকাংশে বানানো প্রলাপ।

মাসুদ : জয়ের কাব্যসমগ্র দেখেছেন?

হুমায়ুন আজাদ : এ-বয়সেই যার কাব্যসমগ্র বেরোয় সে নিশ্চয়ই উন্মাদ।

আ. হ. : পঞ্চাশের এবং ষাটের যাঁরা কবিতা লিখছেন তাঁদের লেখা কি প্রবন্ধের মতো নয়?

হুমায়ুন আজাদ : অনেক আগে র‍্যাঁবো বলেছেন, কবিতা নামে পরিচিত রচনার ৯৯ ভাগ রচনা আসলে ছন্দোবদ্ধ গদ্য। আমি মনে করি নজরুলের কবিতার অধিকাংশই পদ্য, তা উপসম্পাদকীয় হতে পারতো। শামসুর রাহমান, আমার, রফিক আজাদের অনেক রচনা প্রবন্ধ বা উপসম্পাদকীয় হতে পারতো। কিন্তু এগুলো কবিতার বিশেষ, সীমা নির্দেশ করেছে; দেখাতে চাচ্ছে কবিতা কতোটা গদ্যের কাছাকাছি যেতে পারে।

আ. হ. : সৈয়দ শামসুল হক একটা কথা বলেছেন, বাঙলা কবিতায় খণ্ডকবিতার যতো রকম সম্ভাবনা ছিলো সব ক'টার ব্যবহার হয়ে গেছে, যা লেখা হচ্ছে তার সবটাই অভ্যাসবশে, আপনি কি এরকমই মনে করেন?

হুমায়ুন আজাদ : এটা অবশ্য ভাবার বিষয় যে খণ্ডকবিতার যুগ শেষ হয়ে গেছে কিনা। সৈয়দ শামসুল হক কথাটি প্রথম বলেছেন, তা নয়; জীবনানন্দ দাশ অনেক আগেই বলেছেন আমাদের আবার দীর্ঘ কবিতার দিকে যেতে হবে, যদিও তিনি ওই দীর্ঘ কবিতার দিকে যান নি। কেউ কেউ এ নিয়ে নিরীক্ষা করেছেন। বাংলাদেশের দূষিত সমাজ ও রাজনীতি বাঙলা ভাষাটিকেই নষ্ট করে ফেলেছে। বাঙালির আবেগ নষ্ট হয়ে গেছে, স্বপ্ন নষ্ট হয়ে গেছে এবং ভাষা দূষিত হয়ে গেছে। এ-দূষিত ভাষায় কবিতা কবিতা হয়ে ওঠে না, তাই এখন ভাষাকে পরিস্রুত করা দরকার। আবেগ-স্বপ্নকেও পরিস্রুত করে নেয়া দরকার। একজন অসাধারণ কবি না এলে আমরা বুঝতে পারছি না ওই রূপটি কী হবে। সত্তর এবং আশির দশকে যে কেউ কবি হয়ে ওঠে নি, তার কারণ শিক্ষাহীনরা কবিতা লেখার চেষ্টা করছে। তাদের অনেকে ভালো কবিতার বইও পড়ে নি। বাঙলা কবিতা সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই। ধারণাই নেই। অনেকে নির্ভুল বাক্যও লিখতে পারে না।

আ. হ. : কথাটা কি অতিসাধারণীকৃত হয়ে গেলো না? না পড়বার যে প্রবণতা সেটা ষাটে ছিলো, নির্মলেন্দু গুণ না পড়েই কবিতা লিখেছেন।

হুমায়ুন আজাদ : নির্মলেন্দু গুণ ষাটের কবিদের মধ্যে কম পড়াশোনা করেছে। তার কবিতা তার জীবনযাপন থেকে জন্মেছে। কিন্তু এরা জীবনযাপনকেও কবিতা করে তুলতে পারছে না।

আ. হ. : এরপর আমার মনে হয় সত্তর, আশির কবিরাতো খুবই পড়াশোনা করে।

হুমায়ুন আজাদ : তারা পশ্চিম বাঙলার কবিতা পড়ে; পশ্চিম বাঙলার ম্লান কবিতা প'ড়ে কোনো নতুন কবিতা সৃষ্টি করা যাবে না। আমাদের কবিতা সামাজিক, মহাকাব্যিক; পশ্চিম বাঙলার কবিতা প্রধানত ব্যক্তিগত। আমাদের অতি বেশি সামাজিক হতে যাওয়া সীমাবদ্ধতা বটে...

মাসুদ : আপনার এই কথাটা কি স্ববিরোধী হয়ে গেল না? আপনি একবার বলছেন আমাদের বর্তমান রাজনীতি সমাজ কবিতাকে নষ্ট করেছে, আবার বলছেন যে আমাদের কবিতা মহাকাব্যিক?

হুমায়ুন আজাদ : হ্যাঁ। আমাদের কবিতা মহাকাব্যিক কথাটি আমি প্রথম শামসুর রাহমান সম্পর্কে আমার বইটিতে বলেছিলাম, তখন ওটা আমাদের কবিতার গুণ ছিলো, পরে তা নষ্ট হয়ে যায়।

মাসুদ : আমাদের সাহিত্যের অন্যান্য শাখা কতোটা সমৃদ্ধ হয়েছে?

হুমায়ুন আজাদ : বাংলাদেশের সাহিত্য খুব একটা উঁচুমানের সাহিত্য নয়। রুশ বা জার্মান, ফরাশি সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যাবে আমাদের সাহিত্যের অন্যান্য শাখা বেশ দুর্বল।

মাসুদ : বলতে পারবেন কি ক'জন রুশ বা ফরাসি ঔপন্যাসিক উল্লেখযোগ্য?

হুমায়ুন আজাদ : অনেকেই উল্লেখযোগ্য— আমাদের কোনো সোলঝিনিৎশিন, কামু আছে?

মাসুদ : আমাদের উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিক কাকে বলছেন?

হুমায়ুন আজাদ : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। তারপর সব কিছু মিলে ভালো কাজ করেছেন সৈয়দ শামসুল হক।

মাসুদ : আখতারুজ্জামান ইলিয়াস?

হুমায়ুন আজাদ : আখতারুজ্জামান ইলিয়াস অতিপ্রশংসিত। একটিমাত্র উপন্যাস আছে তাঁর, তাঁর খুব প্রশংসা শুনি। যে-ই প্রশংসা করে তাকেই আমি জিজ্ঞেস করেছি বইটি পড়েছো কিনা, দেখি পড়ে নি। আমি স্বীকার করছি আমিও এখনো পড়ি নি। কয়েকদিন ধরে উপন্যাসটি পড়ছি, ৫০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়েছি এবং আমার কাছে মনে হচ্ছে লেখক একটি মারাত্মক উপন্যাস লিখবেন ঠিক করে নেমেছেন, যদিও প্রথম দু-পৃষ্ঠাই আমার কাছে বিভ্রান্তিকর বলে মনে হয়েছে। তবে তাঁর গল্পগুলো চমৎকার।

মাসুদ : নাটক?

হুমায়ুন আজাদ : আমার কাছে ভালো নাটক অবশ্যই পাঠযোগ্য নাটক। মুনীর চৌধুরী, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ইউরোপীয় কাঠামোয় নিরীক্ষাধর্মী নাটক লিখেছেন। এরপর তেমন নাটক হয়নি। আমি যা পড়েছি, তাতে *নুরুলদীনের সারা জীবন*-কেই সবচেয়ে ভালো মনে হয়েছে।

মাসুদ : আপনার সম্পর্কে অভিযোগ আছে আপনি চলচ্চিত্রকে শিল্পমাধ্যম হিশেবে স্বীকার করেন না, অন্যের কাহিনী ধার করে তৈরি করা হয় বলে।

আ. হ. : কিন্তু যিনি একাধারে কাহিনী, সংলাপ, চিত্রনাট্য লিখেছেন তার ছবিকে কিভাবে দেখবেন?

হুমায়ুন আজাদ : এমন ক-জন আছেন পৃথিবীতে? অধিকাংশ চলচ্চিত্রই অন্যের কাহিনীনির্ভর, উপলব্ধিনির্ভর।

আ. হ. : ধরুন রবীন্দ্রনাথ গানের স্রষ্টা, কিন্তু যিনি গাচ্ছেন তিনি কি শিল্পী না?

হুমায়ুন আজাদ : তাঁকে কি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা করবো? তিনি শিল্পী; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁকে তুলনা করবো?

মাসুদ : রবীন্দ্রনাথের গানকে কি গান বলতেন যদি না দেবব্রত-কণিকারা গাইতেন?

হুমায়ুন আজাদ : আমার জন্য দেবব্রত অবশ্য খুব প্রয়োজনীয় নন, রবীন্দ্রনাথের গান আমি প'ড়েই উপলব্ধি করি। দেবব্রতের কণ্ঠস্বর আমার উপলব্ধিতে বাধা দিয়েছে। দেবব্রত-কণিকারা না থাকলেও রবীন্দ্রনাথের গান হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের গান; আর রবীন্দ্রনাথের গান না থাকলে দেবব্রত-কণিকারা কোথায়?

আ. হ. : বাঙলা ভাষায়, ফরহাদ মজহারের প্রসঙ্গে আসি, উনি চাচ্ছেন যে আরবিফারসি শব্দ ব্যবহার করে একটা নিজস্ব বাংলাদেশি বাঙলাভাষা তৈরি করতে।

হুমায়ুন আজাদ : বাঙলা ভাষায় আরবিফারসি শব্দ নিয়ে গত কয়েকশো বছর ধরে নানা তর্ক চলছে, বাঙালি মুসলমান যে মনোব্যাধিগ্রস্ত, এ থেকে তা বোঝা যায়। বাঙলা ভাষায় যে-আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহৃত হয় তা চাষিরা নিয়ে আসে নি, সাধারণ মানুষরা নিয়ে আসে নি। মুসলমান রাজত্বের ফলে ওপর দিক থেকে ক্রমশ নিচের দিকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এটা বাঙলাভাষায় এক ধরনের বিকৃতি। বাঙলাভাষায় যে-বিদেশি শব্দগুলো ঢুকেছে সেগুলো ঢুকেছে সাম্রাজ্যবাদী, ভাষাসাম্রাজ্যবাদী প্রক্রিয়ায়। ফলে বাঙালি জাতি হিসেবে পর্যুদস্ত হয়েছে। উনিশশতক থেকে আরবিফারসির প্রাধান্য কমতে থাকে। ভাষার শব্দের এলাকা হচ্ছে সবচেয়ে চঞ্চল এলাকা, কখনো ঘটে বিশেষ ধরনের শব্দের প্রাধান্য, কখনো অন্য ধরনের। উনিশশতকের বাঙালি যখন একটি সর্ববঙ্গীয় ভাষা সৃষ্টির চেষ্টা করে তখন তারা দেখে বাঙলার জন্য সবচেয়ে স্বাভাবিক হচ্ছে সংস্কৃতজাত শব্দের ব্যবহার। উনিশ ও বিশশতকে বাঙালি মুসলমান তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়ে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে যে আমরা বাঙালি, আমাদের ভাষা বাঙলা, আরবিফারসি শব্দ আমরা বিশেষ ব্যবহার করবো না। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার ফলে এটি আবার প্রবল হয়ে ওঠে, বাঙলা ভাষা বিকৃত থেকে বিকৃততর হতে থাকে। ১৯৪৭-১৯৫২ সময়ে বাঙলা কবিতা লেখা হয়েছে অপাঠ্য, অশ্লীল, ব্যাধিগ্রস্ত, দূষিত বাঙলায়। আমি মনে করি বাঙলা ভাষায় আরবিফারসির প্রবেশ একটা দুর্ঘটনা, তা স্বাভাবিকভাবে প্রবেশ করে নি। '৫২-র আন্দোলন ক্রমশ বাঙলাভাষাকে ওই ব্যাধি থেকে মুক্ত করে ষাটের দশকে এসে বাঙালি মুসলমান অবিকৃত খাঁটি বাঙলা লেখা শুরু করে। এটি মার্জিত, পরিশীলিত, পরিস্রুত। স্বাধীনতার কিছুকাল পর যখন প্রতিক্রিয়াশীলতা দেখা দিতে শুরু করে, সাম্প্রদায়িকতা দেখা দিতে শুরু করে, তখন প্রতিক্রিয়াশীলরা আবার আরবিফারসির মোহে পড়ে। ধর্মীয় কিছু এলাকা ছাড়া বাঙলা ভাষায় আরবিফারসি শব্দ ব্যবহারের কোনো প্রয়োজন নেই। আরবি আমার জ্ঞানচর্চার ভাষা নয়, ফারসিতে আমার আবেগ প্রকাশিত হয় না। ফলে আরবিফারসির কথা যারা বলে তারা রাজনীতিক উদ্দেশ্যে বলে। তারা নিশ্চয়ই কোনো সম্পর্কে এসে গেছে আরবিফারসি অঞ্চলের শাসকদের সাথে, যে-সম্পর্ক তাদের আর্থিকভাবে সাহায্য করছে; আর তারা দেশের একটি সমস্যা তৈরি করে রাখার চেষ্টা করছে। তারা পাকিস্তানমনস্ক, সাম্প্রদায়িক; সাধারণ মানুষ আরবিফারসি শব্দের খবর রাখে না। বাঙলার চাষি জানে না জমি একটি ফারসি শব্দ, ফসল একটি ফারসি শব্দ এবং জমি বা ফসল ব্যবহার ক'রে সে গৌরব বোধ করে না। তারা বাঙলা হিসেবেই তা ব্যবহার করে। কাজেই বাঙলা ভাষা হবে বাঙলা ভাষা, আরবিফারসি দ্বারা দূষিত ভাষা নয়।

মাসুদ : আপনি এতো কিছু থাকতে নারী নিয়ে বই লিখলেন কেন?

হুমায়ুন আজাদ : পূর্বাভাস-এর চাপে এবং নারীবাদীদের বই পড়ার ফলে। নারী খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নারীবাদীদের বই পড়ে আমি মুগ্ধ হই, যা এতো দিন আমার মনে অস্পষ্টভাবে ছিলো তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে; আমি নারী সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ বই লেখার পরিকল্পনা করি। নারীবাদীদের বই আমার বোধকে তীক্ষ্ণ করেছে।

আ. হ. : আপনি কি নিজেকে নারীবাদী মনে করেন?

হুমায়ুন আজাদ : হ্যাঁ।

আ. হ. : আপনি একবার একটা কলামে বলেছিলেন এ সমাজকে এখন আক্রমণ করতে হবে শরীর দিয়ে, এই উক্তি কি নারীবাদের বিপরীত ও স্ববিরোধী নয়?

হুমায়ুন আজাদ : না। শরীর এখানে একটা ট্যাবু। শরীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আত্মার থেকে অনেক বেশি; শরীর দিয়ে সমাজকে আক্রমণ করা নারীবাদের বিরোধী নয়, বরং পক্ষে।

আ. হ. : যে কোনো বাদ বা ধারণা জীবনাচরণে ফুটিয়ে তুলতে হয়। আপনি তো বিবাহিত জীবনযাপন করেন।

হুমায়ুন আজাদ : তা তো আমি ফুটিয়ে তুলিই। বিবাহ? আমাদের সমাজ এমন যে শারীরিক কারণে বিবাহিত জীবনযাপন না করে উপায় নেই।

আ. হ. : কোনো নারীপুরুষের সম্পর্ক শারীরিক সম্পর্কে গড়ালে আপনার আপত্তি নেই। তো, আপনার কি এমন ঘটেছে?

হুমায়ুন আজাদ : একটি নারী ও পুরুষ আকর্ষণ অনুভব করলে অবধারিতভাবে শারীরিক সম্পর্কে পৌঁছাবে। আমার জীবনে কী ঘটেছে, তা এ মুহূর্তে না বলাই ভালো।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন : মাসুদুজ্জামান ও আনিসুল হক
ভোরের কাগজ সাময়িকী : ৫ চৈত্র ১৩৯৮

হুমায়ুন আজাদের সাক্ষাৎকার ও এক চোখে দেখা : হুমায়ুন আজাদের উত্তর

ভোরের কাগজ-এর সাময়িকীতে[১০ বৈশাখ ১৩৯৯] প্রকাশিত 'হুমায়ুন আজাদের সাক্ষাৎকার ও এক চোখে দেখা'র একটি প্রতিলিপি কয়েক সপ্তাহ আগে পাঠানো হয়েছিলো আমার কাছে : সাময়িকী-সম্পাদক জানতে চেয়েছিলেন ওই অশালীন লেখাটি ছাপা যাবে কিনা? লেখাটির প্রকাশ আমি রোধ করতে পারতাম; কিন্তু আমি বাক, এমনকি প্রলাপেরও স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি ব'লে না প'ড়েই ওটির প্রকাশে সম্মতি দিই। অপাঠ্য পাণ্ডুলিপির বদলে মুদ্রিত বস্তু পড়তেই আমি পছন্দ করি। কারো ভেতরে পুঁজ জমলে তা বের করে দেয়াই ভালো। চারপাশে অপশিক্ষার আবর্জনা কেমন ফুলেফেঁপে উঠছে, কেমন বিস্তার ঘটছে অসংস্কৃত রুচির, মস্তানি কীভাবে গলি থেকে উঠে এসে দখল করে নিচ্ছে পত্রপত্রিকার স্তম্ভ, তার প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা আজফার হোসেনের অপলেখাটি। ওটি প'ড়ে মনে হয়েছে একটি ছোট্ট বিকৃত মৌলবাদী ছাড়া পেয়ে গেছে পত্রিকার পাতায়, এক বালক চিন্তারাজাকার ছুরি হাতে ছুটে চলেছে স্তম্ভে স্তম্ভে। আজফার হোসেন বাঙলাদেশের নব্বইয়ের দশকের রুচিবিকার, অপশিক্ষা, মস্তানি ও মৌলবাদের ঘিনঘিনে রূপ। তাঁর ভাষা অশুদ্ধ, বক্তব্য অব্যবস্থিত; সংস্কৃতিহীনতার নোংরা ছাপ লেগে আছে তাঁর সম্পূর্ণ লেখায়। তিনি অপশিক্ষিত; বই পড়ে না বোঝার, বা বদহজমের মল ছড়ানো তাঁর সারা লেখায়। অপরকে শেখানোর প্রভাষকসুলভ উদ্দীপনায় তাঁর লেখাটি হয়ে উঠেছে আবর্জনাস্তূপ। এর আগে তাঁর দু-একটি অব্যবস্থিত অপাঠ্য লেখা আমি পড়েছি, দেখেছি তিনি মুখের কথা অপহরণ করতে লজ্জা পান না। আজকের কাগজ-এর আড্ডায় তিনি আমার মুখোমুখি বসেছেন কয়েকবার, পরে দেখছি আমার অনেক আলাপচারিতা তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তব্য হিসেবে লিখে ফেলেছেন কলাম ও উপসম্পাদকীয়তে। এতে তার চরিত্রের একটি দিক ধরা পড়েছে আমার কাছে; আরেকটি দিক ধরা পড়েছে তাঁর পরিচিতিতে। ভোরের কাগজ ও আজকের কাগজ লেখক-অলেখকদের পরিচিতি ছেপে তাঁদের উপহাসের পাত্র ক'রে তুলেছে। আজফার হোসেন সাহেব তাঁর পরিচিতিতে

ছাপেন তিনি কোন বিভাগের দশ পয়সার, আর কোন বিভাগের পাঁচ পয়সার প্রভাষক, তিনি কোন নিউজপ্রিন্টগুচ্ছের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, আর কোন নিউজপ্রিন্টগুচ্ছের সিকি সম্পাদক; অর্থাৎ তিনি সেই কিংবদন্তির কাঁকুড়, যার বীচি নিজের থেকে সব সময়ই দীর্ঘতর। তাঁর এ-লেখাটি বোধ হয় ওই কাঁকুড়ের বৃহত্তম ও সম্ভ্রান্ততম বীচি জন্মানোর উদ্যোগ।

অপপণ্ডিতির একটু অহমিকা আছে আজফার হোসেনের, তাই তাঁর পণ্ডিতিকে একটু যাচাই করে দেখা দরকার। সামান্য ঘাঁটলেই ধরা পড়ে এ-বিদ্যারত্ন যা পড়েছেন তা বোঝেন নি, এবং অনেক কিছু না পড়েই ভেবেছেন পড়েছেন। না পড়ে ও না বুঝে পণ্ডিতি করার রোগটি তাঁর কুষ্ঠরোগের মতোই প্রকট। তাঁর লেখার শুরু ও শেষে হ্বিটগেনস্টাইন থেকে একটি উদ্ধৃতি দুবার রয়েছে।

হ্বিটগেনস্টাইন থেকে উদ্ধৃতি দেয়া এখন অপশিক্ষিতদের ফ্যাশন; তবে আজফার হোসেন না বুঝে হ্বিটগেনস্টাইনের উক্তি বাঙলায় অনুবাদ করতে গিয়ে শোচনীয় ভুল করেছেন। হ্বিটগেনস্টাইনের কথা বলে তিনি যা চালিয়েছেন, ওই ভাষাদার্শনিক তা বলেন নি। হ্বিটগেনস্টাইনের Tractatus Logico-Philosophicus-এ (১৯২১) আছে একটি বাক্য :

What can be said at all can be said clearly and *what we can not talk about we must pass over in silence.* [বাঁকা অক্ষর আমার]।

এ-যৌগিক বাক্যের দ্বিতীয়াংশ না বুঝে শোচনীয় ভুল অনুবাদ করেছেন ছোট্ট অপপণ্ডিত আজফার হোসেন। আজফার হোসেন হয়তো হ্বিটগেনস্টাইনের বইটি দেখেন নি, কোথাও পেয়েছেন হ্বিটগেনস্টাইনের উক্তিটি; তাই ওটি তাঁর হজম হয় নি। হজম না হওয়ার ফল ভুল বোঝা ও ভুল অনুবাদ : 'যেখানে বলার মতো কথা থাকে না, সেখানে নৈঃশব্দই শ্রেয়।' হ্বিটগেনস্টাইনের বক্তব্য এর থেকে বহু আলোকবর্ষ দূরে, এতো দূরে যে তা আজফার হোসেনের মতো অপগ্রহের কাছে পৌঁছে নি। Tractatus-এ হ্বিটগেনস্টাইনের পরিমাপ করতে চেয়েছেন ভাষার প্রকাশশক্তি, সীমানা। উদ্ধৃতিটিতে তিনি বলেছেন :

যা আদৌ বলা সম্ভব তা স্পষ্টভাবেই বলা সম্ভব, এবং যা আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয় তা উপেক্ষা করে যেতে হবে নিঃশব্দে।

হ্বিটগেনস্টাইন 'বলার মতো কথা'র কথা বলেন নি, বলেছেন ভাষার সাহায্যে কতোটা বলা সম্ভব ও অসম্ভব, অর্থাৎ ভাষার প্রকাশশক্তির কথা। তাঁর মতে ভাষায় সব কিছু প্রকাশ সম্ভব নয়; তবে যা প্রকাশ সম্ভব তা স্পষ্টভাবেই প্রকাশ সম্ভব, আর যা প্রকাশ সম্ভব নয়, সে-সম্পর্কে নীরব থাকাই ভালো। তাই আজফার হোসেন তাঁর অপলেখাটির শুরু ও শেষে হ্বিটগেনস্টাইনের নামে যা চালিয়েছেন, তা হ্বিটগেনস্টাইনের নয়; তা আজফার হোসেনের একটি নিরর্থক বাক্য দিয়ে

বুঝিয়ে দিচ্ছি। আজফার হোসেন লিখেছেন, 'না, যার নাম তিনি উচ্চারণ করেছেন অর্থাৎ "জয় গোস্বামী" তিনি নিজেই নিজের নাম ভুলে যান নি; যিনি ভুলে যেতে পারেন বলে আশংকা করেছেন কিংবা ভুল নাম বলেছেন বলে সংশয়ী, তিনি ওই বাক্যের রচয়িতা নিজেই।' এটা নিরর্থক বাক্য; আজফার হোসেন এখানে যা বলতে চেয়েছেন, তা যদি বলা সম্ভব হতো তাহলে তা স্পষ্টভাবেই বলা যেতো; কিন্তু তা তাঁর পক্ষে বলা সম্ভব হয়নি, তাই হ্বিটগেনস্টাইনের পরামর্শ অনুসারে তাঁর উচিত ছিলো নীরব থাকা; কিন্তু তিনি বাচাল বালক, নীরব না থেকে বানচাল করে দিয়েছেন হ্বিটগেনস্টাইনের ভাষিক তত্ত্ব। যুগে যুগে অপশিক্ষিতরা এভাবেই বানচাল করে দেয় অজস্র অসাধারণ তত্ত্ব; এবং একটি তত্ত্ব বানচালের গৌরব কয়েক দশক ধরে শোভা পাবে আজফার হোসেনের ছোট্ট মস্তকখানিতে!

পড়াশুনো না করে, ও ভুল পড়াশুনো ক'রে অপপণ্ডিতি করার মানসিক জ্বর আজফার হোসেনের খুবই প্রবল। তাঁর জন্যে উদ্বিগ্ন বোধ করছি। তিনি লিখেছেন, 'তাদের কেউ তো আজাদকে ওই কথাটি বলে দিতে পারেন নি যে ফরাসি কবি র‍্যাঁবো থেকে যে উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন তিনি তা আসলে ভুল। কথাটি, যা র‍্যাঁবোর নামে চালানো হয়েছে, আসলে এডগার এ্যালেন পো'র। আজাদ তরুণ কবিদের পড়াশুনোর সীমাবদ্ধতা নিয়ে কটাক্ষ করেছেন, কিন্তু তিনি নিজেও কি পড়াশুনো করেন ঠিক মতো?... তিনি নিশ্চয়ই দাবি করবেন যে তিনি র‍্যাঁবো পড়েছেন, কিন্তু ভুলভাবে উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন ওই র‍্যাঁবোর নামেই। মূর্খরা তাঁর কথায় নাচতে পারে কিন্তু যারা একটু সচেতন তারা ঠিকই বোঝেন...।' আজফার হোসেন জানেন না যে সম্মানসূচক যাঁরা, ও তাঁরায় একটি চন্দ্রবিন্দু থাকে, তাই তিনি অবলীলায় সম্মান-অসম্মানসূচক সর্বনাম ও ক্রিয়ারূপ ব্যবহার করেন; বোঝেন না তিনি কী করছেন [এটা ছাপার ভুল নয়, তাঁর পাণ্ডুলিপিতে ভুলের পরিমাণ অনেক বেশি]। আজফার হোসেনের পণ্ডিতির সবটাই যে ভুল ভিত্তির ওপর দাঁড়ানো, তাঁর ওপরের উক্তিটিও সে-প্রমাণ দিচ্ছে। তাঁর উক্তিতে পরিচয় পাই তাঁর অশেষ মূর্খতা ও ইতর রুচির। আমার যে-উক্তি সম্পর্কে তিনি তাঁর এ-পাণ্ডিত্য প্রচার করেছেন, তা হচ্ছে: 'র‍্যাঁবো বলেছেন, কবিতা নামে পরিচিত রচনার ৯৯ ভাগ রচনা আসলে ছন্দোবদ্ধ গদ্য...।' আজফার হোসেন বদহজমের বিশ্বকোষ, কোনো প্রমাণ না দিয়েই কথা বলে রটিয়ে দেন তাঁরই নিন্দিত মূর্খতা। কথাটি অ্যালান পো বলেছেন, কোথায় বলেছেন মহামহোপাধ্যায়? কথাটি র‍্যাঁবোর, এবং র‍্যাঁবোরই; তবে আমি র‍্যাঁবোকে অবিকল উদ্ধৃত করি নি। কথাটি আছে র‍্যাঁবোর "The Poet Revolutionary Seer" (১৮৭১) নামক পত্র প্রবন্ধে। আমার উক্তিটি র‍্যাঁবোর যে-উক্তির রূপান্তর, তা হচ্ছে [দ্র. R Ellmann ও C Feidelson সম্পাদিত (১৯৬৫, পুমু ১৯৭৭) the Modern Tradition, পৃ. ২০৩]:

From Greeve to the romantric movement – in the Middle Ages- there are men of letters, versifiers. From Ennius to theroldus, theroldus: o Casimir Delavigne, it's all rhymed prose, a game, the enfeeblement and glory of countless idiotic generations...

বুদ্ধদেব বসুও বোদলেয়ার : তাঁর কবিতার (১৯৬১, ৩) ভূমিকায় লিখেছেন :

ঐতিহাসিকেরা, সরকারি সমালোচকেরা, এঁদের কবি বলে মানতে বাধা : কিন্তু যাঁরা নিজেরা দ্রষ্ট, অন্তত কবিতার বিষয়ে দ্রষ্টা, তাঁরা, র‍্যাঁবোর মতোই, এঁদের সমিল গদ্যলেখক বলেই জানেন।

দেখা যাচ্ছে আজফার হোসেন এমন অপশিক্ষিত অসংস্কৃত বালক, যাঁর সাথে তর্ক করা সাজে না। তাহলে আমাকে বাঙলা মায়ের কোটি কোটি সন্তানের সাথে তর্কে নষ্ট হতে হবে। তবে আজফার হোসেনের মতো আত্মম্ভরী অপশিক্ষিত সম্ভবত পথেঘাটে মেলে না; তাঁকে খুঁজতে হবে কোনো আরণ্য পাঠশালায়।

আজফার হোসেনের যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তা হচ্ছে তাঁর অশেষ রুচিবিকার ও অসংস্কৃতি। ইতরতাকে তিনি মনে করেন দ্বিমত পোষণ। নীরদ চৌধুরী ('নীরদ' বানানটিও তিনি জানেন না, তাঁর হাতে লেখা পাণ্ডুলিপিতে বানান পাচ্ছি 'নীরোদ'; প্রুফপাঠককে ধন্যবাদ!) সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'তিন-চারটে ভাষা সে পড়তে পারে, বুঝতে পারে।' নীরদ চৌধুরী খুবই তুচ্ছ ব্যক্তি, তাই প্রভাষক আজফার হোসেন তাঁকে নির্দেশ করেছেন 'সে' সর্বনাম দিয়ে, এবং ব্যবহার করেছেন অসম্মানসূচক 'পারে' ক্রিয়ারূপ। আজফার হোসেন সাহেব লিখেছেন, 'হুমায়ুন আজাদরা যে এ ধরনের অনুপ্রেরণা খুঁজে পাবেন'; 'আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ে কোনো খবর রাখেন না বলেই...' এমন ইতর রুচির পরিচয় দিয়েছেন তিনি অপলেখাটি ভ'রে। বাঙলা নয়, গালিগালাজ আজফার হোসেনের সহজাত মাতৃভাষা, আর অপশিক্ষিত অশ্লীল অহমিকা তাঁর ইরিধানের ভাত। তাঁর সাথে তর্ক করার অর্থ পৌরনর্দমায় নেমে যাওয়া; তাই তর্ক নয়, শুধু কয়েকটি প্রসঙ্গে কিছু কথা বলবো, যা তার 'মূর্খতা' মোচন করতে পারে। তবে সে-আশাও আমি করি না, কেননা আজফার হোসেন সংস্কৃতিহীনতার যে-স্তরে আছেন, সেখান থেকে তাঁকে কেউ উদ্ধার করতে পারে না।

'আশার চেয়ে হতাশা অনেক গভীর ব্যাপার' : আমার এ বোধের সাথে দ্বিমতের সম্পূর্ণ অধিকার তাঁর ও সমস্ত প্রাণীর রয়েছে; তবে তিনি দ্বিমতের বদলে আশ্রয় নিয়েছেন তাঁর স্বাভাবিক যুক্তি-গালাগালির। গালাগালির জন্যে এর পর তাঁকে অনেকে ভাড়া করার কথা ভাবতে পারেন। মানুষকে, স্থূলভাবে, বাস করতে হয় আশার মধ্যেই; নইলে জীবন নামক সংকট ও নিরর্থকতা মানুষের পক্ষে সহ্য করা হতো অসম্ভব। মানুষ, জীবনদণ্ডিত ও আশাদণ্ডিত, হ্বিটগেনস্টাইনের বোতলে-আটকে পড়া মাছি; আশা হচ্ছে ওই বোতল থেকে বেরোনোর দুরাশা। মানুষের কথা ছেড়ে বাঙালির কথাই ধরা যাক; বাঙালি জানে জীবন এক হিংস্র আগুন, ওই আগুনে জ্ব'লে জ্ব'লে তাকে বেঁচে থাকতে হয়, তাই আশাই ভরসা।

যে-অঞ্চলে জীবন যতো দুর্বহ সেখানকার মানুষ ততো আশাবাদী, কেননা আশাই তার কাছে জীবন। তবে এ-স্থূলতা পেরিয়ে গেলে চোখে পড়ে মানুষের জীবন আসলে সম্পূর্ণ নিরর্থক; এই বেঁচে থাকা, প্রেম, কাম, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, দর্শন সবই নিরর্থক; মানুষের সব স্বপ্ন ও কাজ হচ্ছে ধ্বংসের জন্যে বিরতিহীন প্রস্তুতি। মহাকালের চোখে মহান রবীন্দ্রনাথ ও অসংস্কৃত আজফার হোসেনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, দুজনই তার শিকার । মানুষ যা কিছু করে, তার মধ্যে যা কিছুকে গণ্য করা হয় শ্রেষ্ঠ কাজ বলে বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পকলা ও আরো বহু কিছু সবই হচ্ছে নিরর্থ জীবনকে তাৎপর্যপূর্ণ করার ব্যর্থ প্রয়াস। আশা হচ্ছে মলম, জীবনের অ্যাবসার্ডিটিকে সহনযোগ্য করার চেষ্টা। বেঁচে থাকার জন্যে স্থূল আশা দরকার, তবে ছকবাঁধা আশা হাস্যকর। মানুষের ইতিহাস ভরে আশার কথা উচ্চারিত হয়েছে, উচ্চারিত হবে চরম বিনাশ পর্যন্ত, কিন্তু ওই আশার ধ্বনিপুঞ্জ হচ্ছে অবশ্যম্ভাবী বিনাশের ভয়ে সন্ত্রস্ত মানুষের আর্ত চিৎকার। প্রতিটি আশার কথার উৎসারণ ঘটে হতাশার উৎস থেকে; প্রতিটি আশার বাণীর নিচে হতাশার চিৎকার শোনা যায়। চারদিকে তাকালেই হতাশা শুধু সামাজিক রাজনীতিকভাবে নয়, দার্শনিকভাবেও চোখে পড়ে; রবীন্দ্রনাথ নেই কিন্তু আজফার হোসেন আছেন, এর চেয়ে হতাশার কথা আর কী আছে! আজফার হোসেন আটকে আছেন ছকবাঁধা আশার খোঁয়াড়ে, সেখানে তিনি যে-পাশব চিৎকার করছেন, তারই নাম আশাবাদ।

বাঙালি ও পশ্চিম ইউরোপ বিষয়ে আমার উক্তি সম্পর্কে আজফার হোসেন যা বলেছেন, তা একটি অপশিক্ষিত আত্মম্ভরী কুয়োর ব্যাঙের গলাফোলানো শ্লোগান। আমি বাঙালির কঠোর সমালোচনা করি, কেননা আমি বাঙালি; আমি মনে করি আমার গোত্রের সমালোচনা করার অধিকার যতোটা আমার আছে, অন্য গোত্রের সমালোচনা করার অধিকার আমার ততোটা নেই। আমি বাঙালিকে আক্রমণ করি, কেননা বাঙালির মধ্যে দেখতে চাই উৎকর্ষ; কিন্তু দেখি তার বিপরীত। অহমিকা বা হীনমন্যতা কোনোটিতেই আমি ভুগি না, আমি নিরপেক্ষভাবে দেখতে চাই সত্য; তাই আমি বাঙালির স্তুতি করি না। আজফার হোসেনের মতো রুগ্ন বাঙালিরা হীনমন্যতায় ভোগেন বলেই গলা ফুলিয়ে আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করেন। সমাজ ও রাজনীতি বাঙালিকে করে তুলেছে একটি অসুস্থ জনগোষ্ঠী, যেমন রুগ্ন করে তুলেছে আজফার হোসেনকে। বাঙালি গোত্রের শ্রেষ্ঠ পুরুষেরা কোনো-না-কোনোভাবে অ-'বাঙালি' (মনে কি পড়ে না; রেখেছো বাঙালি করে মানুষ করো নি?) তাঁরা অনেক ওপরে উঠতে পেরেছেন আজফার হোসেন শ্রেণীর পংক্তি থেকে। এমন নয় যে আমি বাঙালির হীনতায় খুব আনন্দ পাই, বরং গভীর বেদনাবোধ করি আমার গোত্রের জন্যে, এবং তাদের উৎকর্ষের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে সমালোচনা করি। কিন্তু বাঙালি এগিয়ে চলে পতনের দিকে, যেমন চলেন আজফার হোসেন।

পশ্চিম ইউরোপের আমি অনুরাগী, তবে ওই অনুরাগ ব্যক্তিগত বৈষয়িক স্বার্থ থেকে নয়; আমি অনুরাগী তাদের অসামান্য সৃষ্টিশীলতার। আধুনিক সভ্যতার স্রষ্টা তারাই, আমরা আধুনিক বিশ্বকে কিছুই দিই নি। জ্ঞান আর সৃষ্টিশীলতার জগতের বড়ো বড়ো ব্যাপারগুলোর কথা ছেড়ে দিয়ে কিছু ছোটো ব্যাপারে কথাই বলি; আমার পড়ার ঘরের চারদিকে যা কিছু ছড়ানো, তার একটিও বাঙালি সৃষ্টি করে নি। ওই পাখা, বিদ্যুৎ, মুদ্রণ, বলপয়েন্ট, কম্পিউটার ও আরো তুচ্ছ বস্তুরাশি সবই সৃষ্টি করেছে পশ্চিম, তাতে আজফার হোসেনের ও তাঁর পিতামহের কোনো ভূমিকা নেই। বাঙলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণটি তাঁরা লিখেছেন, সংস্কৃতের সবচেয়ে ভালো অভিধানটি তাঁরা লিখেছেন; আর আধুনিক বাঙলা সাহিত্য তো তাঁদেরই চেতনার বাঙালি রূপ। অহমিকাঅসুস্থ কুয়োর সম্ভ্রান্ত নাগরিকের মতো আজফার হোসেন বলেছেন, 'আমাদের যা কিছু উন্নতি ঘটেছে তা আমাদের কারণেই। আমরা যে পশ্চিমের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছি, সে তো আমাদেরই পশ্চিমকে নিজের মতো করে আবিষ্কার...।' আমাদের উন্নতি ঘটেছে? উন্নতি কাকে বলে আজফার হোসেন; পশ্চিমি ঋণে শীতাতপনিয়ন্ত্রণকে? আজফার হোসেন

শিহরণজাগানো একটি ঐতিহাসিক সংবাদ দিয়েছেন যে আমরা 'যোগাযোগ স্থাপন' করেছি পশ্চিমের সাথে, আর 'নিজের মতো করে আবিষ্কার' করেছি পশ্চিমকে! আজফার হোসেন, আপনি কি পশ্চিমের সাথে 'যোগাযোগ স্থাপন', আর 'পশ্চিমকে নিজের মতো করে আবিষ্কার' করেছেন পলাশির প্রান্তরে?

'পশ্চিম ক্রমশ মুক্তির দিকে এগিয়ে গেছে' : আমার একথায় আজফার হোসেন হাহাকার করে কতকগুলো পচে-যাওয়া কথা শুনিয়েছেন। 'পুঁজির নিপীড়ন', 'সাম্রাজ্যবাদ' প্রভৃতি বুলি, যা খুবই জনপ্রিয় স্থূল বালকদের কাছে, সেগুলো তিনি আবার শুনিয়েছেন। আজফার হোসেনের মতো বুলির

পাঁচালিকারদের ধারণা শোষণ, পীড়ন পশ্চিমের আবিষ্কার; আর পুব হচ্ছে দেবতাদের এলাকা। 'পুঁজির নিপীড়ন', 'সাম্রাজ্যবাদ' খুবই খারাপ; তবে আমার বড়োই সাধ হয় যে পুব একটু 'পুঁজির নিপীড়ন', ও 'সাম্রাজ্যবাদ'-এর চর্চা করুক। আমি আজফার হোসেনের মতোই অহমিকায় ফেঁপে উঠতাম যদি আমার পূর্বপুরুষ নৌকো বেয়ে গিয়ে দখল করতো ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, ও সমগ্র পশ্চিম; পরপর সেখানে চালাতো প্রচণ্ড শোষণপীড়ন, সব ধন লুণ্ঠন করে নিয়ে আসতো দেশে; খুব গর্ব করতাম যদি আমার পূর্বপুরুষ উদঘাটন করতো সৌরজগতের সূত্র, সূচনা করতো শিল্পবিপ্লবের, জন্ম দিতো বুর্জোয়াদের, শুরু করতো শোষণের নতুন প্রক্রিয়া, এবং একদিন উপনিবেশ থেকে ফিরে শুরু করতো এমন প্রক্রিয়া, যা নিন্দিত হতো 'সাম্রাজ্যবাদ' নামে। এসব বাঙালি করে নি, পুব করে নি, করেছে পশ্চিম; পশ্চিমের সে-প্রতিভা ছিলো। শোষণপীড়ন সম্পর্কে চুপ থাকাই ভালো; শোষণপীড়নে পশ্চিমের থেকে পুব অনেক দক্ষ ও নির্মম; পুবের ছোটো ছোটো একনায়কেরা যে-অবাধ পীড়ন করেছে ও আজো করে, পশ্চিমের বড়ো বড়ো একনায়কেরাও তার কথা ভাবতে পারে নি। আজফার হোসেন প্রশ্ন করেছেন, 'পশ্চিম কি মানুষের মুক্তি চায় আসলে?' এ-প্রশ্নে লুকিয়ে আছে এমন বিশ্বাস যে মানুষের মুক্তির চাবিটি রয়েছে পশ্চিমের হাতে। নেই কেনো নেই পুবের হাতে? পুব কি মানুষের মুক্তি চায়? পশ্চিম অন্তত গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রের কথা বলেছে, আমরা বলেছি কিসের কথা? পশ্চিমের শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যেও কিছুটা মানবিকতা আছে, পুবের আছে নিরেট অমানবিকতা। আজফার হোসেনের হাতে একটি সমাজরাষ্ট্র ছেড়ে দিলে দেখা যাবে তিনি জল্লাদ হয়ে উঠেছেন। আজফার হোসেন লিখেছেন, 'পশ্চিম ইউরোপের প্রতি এক ধরনের পক্ষপাতিত্ব আজাদের উচ্চারণে লক্ষণীয়। তাই তিনি তাঁর স্বপ্নে এদেশের সমাজকে চূড়ান্ত উৎকর্ষে নিয়ে যেতে চান না; নিয়ে যেতে চান পশ্চিম ইউরোপের সমাজকে।' তিনি কোনো কিছুই মনোযোগ দিয়ে পড়েন না, বা বোঝেন না। আমার সাক্ষাৎকারে আমি পশ্চিম ইউরোপের সমাজকে চূড়ান্ত উৎকর্ষে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখি নি, আমি নেয়ার কে? যাদের সমাজ তারাই উৎকর্ষ সম্পন্ন করবে। আমি বলেছি সারা পৃথিবীর কথা; সারা পৃথিবী যদি পশ্চিম ইউরোপীয় সমাজের চূড়ান্ত উৎকৃষ্ট অবস্থায় পৌঁছে, তাহলে সে-পৃথিবী সুখকর হবে আমার জন্যে। আমি বাংলাদেশের জন্যেও ওই সমাজই চাই, যদিও তা দুঃস্বপ্ন। এতে ভাবার কোনো কারণ নেই যে আমি সমাজতন্ত্রবিরোধী; তবে পশ্চিম ইউরোপীয় সমাজের উৎকৃষ্টরূপ যদি পৃথিবী ভরে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়, তাহলে শ্রমিকও সমাজতন্ত্রের কথা বলবে না। শোষণপীড়নের জন্য দায়ী কোনো গোলার্ধ নয়, দায়ী মানুষ।

কবিতা সম্পর্কেও কথা বলেছেন আজফার হোসেন, যদিও কবিতা ও আজফার হোসেন হচ্ছে চূড়ান্ত বিসঙ্গতি, এ-দু-বস্তু একসাথে যায় না। তবু তিনি

আমাকে শিখিয়েছেন কবিতাসৃষ্টি ও ব্যাখ্যার সূত্র! এঁর প্রতিভায় আমি যারপরনাই মুগ্ধ, এঁকে শিগগির বিদেশে রপ্তানি করা দরকার! তত্ত্বের সাথে কবিতা মেলানো যায় কিনা, কতোটা যায়, এসব তাঁর পাঠশালায় গিয়ে আমি নিশ্চয়ই একদিন শিখবো, কিছুটা অপশিক্ষা আমারও দরকার; তবে তাঁর কিছুটা সুশিক্ষা প্রয়োজন। কবিতার কোনো তত্ত্ব যিনি প্রস্তাব করেন, আশা করবো তাঁর কবিতায় ওই তত্ত্বের বাস্তবায়ন ঘটবে; যা ঘটলেও বিশেষ ক্ষতি নেই, যদি তা হয়ে ওঠে কবিতা। যদি দেখি কবিতায় তত্ত্বের বাস্তবায়ন ঘটে নি, রচনাটি কবিতাও হয়ে ওঠে নি, তখন বুঝবো ইশতেহারপ্রণেতা প্রতিভাহীন বাচাল ব্যক্তি। আঁদ্রে ব্রেতোঁ ঈশ্বর গুপ্তের মতো কবিতা লিখবেন না। কেউ বা কোনো গোষ্ঠী চমৎকার কাব্যতত্ত্ব পেশ করেও লিখতে পারেন বাজে কবিতা, আমি সে-কথাই বলেছি; কিন্তু তা না বুঝে আজফার হোসেন মূর্খতা-মূঢ়তা মিলিয়ে মিশিয়ে দিয়েছেন এক প্রভাষিক বক্তৃতা।

চলচ্চিত্র সম্পর্কে আমার মত আক্রমণ করতে গিয়ে আজফার হোসেন শেক্সপিয়রের প্রসঙ্গ তুলেছেন যে শেক্সপিয়র, সিনেমা পরিচালকদের মতোই, পরনির্ভর। মৌলিকতা ও পরিনির্ভরতার কথা উঠলেই আজফার হোসেনের মতো অসারগণের মুখে শেক্সপিয়রের নাটকগুলোর কথা শোনা যায়, যেনো শেক্সপিয়র যেহেতু অন্যদের কাহিনী অবলম্বনে নাটক লিখেছেন, তাই যে-ই অন্যের কাহিনী নেয়, সে-ই শেক্সপিয়র! পৃথিবী আজ ভরে গেছে সিনেমার শেক্সপিয়রে। অন্যদের কাহিনীর ক্ষীণ সূত্র নিয়ে হ্যামলেট বা ওথেলো বা ম্যাকবেথ লেখা, আর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালী কেটে কেটে, নষ্ট করে, সত্যজিতের পথের পাঁচালী তৈরি করা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। শেক্সপিয়র অনের কাহিনী কতোটুকু নিয়েছেন, তা ব্যাপক গবেষণার বিষয়; এ সম্পর্কে আজফার হোসেন GC Taylor এর Shakespeares's Debt to Montaigne (১৯৫৭), G Bullough-এর Barrative and Dramatic Sources of Shakespeare (১৯৬২) দেখতে পারেন। শেক্সপিয়রে যা মূল্যবান তা পরনির্ভরতা নয়, প্রতিভা। অন্যের কাহিনীসূত্র নিয়ে হ্যামলেট লেখা মানবপ্রজাতির একজনের বিস্ময়কর প্রতিভার লক্ষণ, আর বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী ছিঁড়ে সত্যজিতের পথের পাঁচালী তৈরি চিত্রগ্রহণদক্ষতার পরিচায়ক। আরেকটি উৎকৃষ্টতর হ্যামলেট বা ওথেলো বা ম্যাকবেথ বা মেঘনাদবধ মানুষের ইতিহাসে আর লেখা হবে না; কিন্তু সত্যজিতের পথের পাঁচালীর থেকে উৎকৃষ্টতর পথের পাঁচালী হয়তো তৈরি হবে আগামী দশকেই। চলচ্চিত্র পরজীবী, প্রধান সাহিত্য অবলম্বন না করে তা কোনো গৌরব দাবি করতে পারে না; আর সিনেমা পরিচালকেরাও কোনো মৌলিক প্রতিভা নন। সত্যজিতের কথাই ধরা যাক; তাঁকে নিয়ে মাতামাতি গ্রাম্যতাকেও ছাড়িয়ে গেছে; এ-মত্ততা বুঝিয়ে দেয় যে যা কিছু ঝকঝক করে, তাই আজকাল সোনার থেকে মূল্যবান। চলচ্চিত্রে কোনো মৌলিক মহৎ কিছু সৃষ্টি অসম্ভব; তবে সিনেমা দেখার

জিনিস, তা দেখতে পারে যে-কেউ, এবং উপলব্ধিও বিশেষ করতে হয় না- এজন্যেই এতো মাতামাতি; তার সাথে জড়িয়ে আছে বিপুল প্রচার, টাকা, ও যৌনাবেদন, তা যেহেতু রঙচঙে, মস্তিষ্কহীন মানুষেরা যেহেতু তাতে মেতে ওঠে, তাই সিনেমাকে এখন দারুণ ব্যাপার বলে মনে করানো হয়। সিনেমা অপশিল্প; তা সৃষ্টি নয়, তৈরি পণ্যসামগ্রী। বিভূতিভূষণ বা রবীন্দ্রনাথ, এমনকি অতিসাধারণ শংকর ছাড়া সত্যজিতের কোনো অস্তিত্ব নেই; বিভূতিভূষণ, রবীন্দ্রনাথ, শংকর ও অন্যদের ছাড়া তিনি হয়ে থাকেন ফেলুদা-শঙ্কু সিরিজের সামান্য লেখক বা নায়ক-এর অনুল্লেখযোগ্য পরিচালক। সত্যজিত যদি ভারতরত্ন হন, তবে বিভূতিভূষণ বিশ্বরত্ন, সভ্যতারত্ন; কিন্তু রগরগে প্রচারের যুগে মহৎ বিভূতিভূষণকে পৃথিবী কেনো ভারতও চেনে না, চেনে গৌণ সত্যজিতকে। বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী মহান সৃষ্টি; এর পর অসংখ্য সত্যজিত আসবেন, নানাভাবে চলচ্চিত্রিত করবেন এ কাহিনী, পালন করবেন গৌণ ভূমিকা। বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালীর পাশে সত্যজিতের চলচ্চিত্রটি খুবই শোচনীয় বস্তু, ওটি তৈরি না হলেও ক্ষতি ছিলো না; কিন্তু বিভূতিভূষণ যদি পথের পাঁচালী না লিখতেন, তাহলে ক্ষতি হতো সভ্যতার। পথের পাঁচালী লেখার জন্যে দরকার প্রতিভা, তার সিনেমা তৈরির জন্যে দরকার কলাকৌশল। বিশ্বজোড়া গ্রাম্যতার বর্তমানপর্বে পৃথিবী বিভূতিভূষণকে ভুলে মালা দিয়েছে সত্যজিতকে, এতে বোঝা যায় সভ্যতা কোন শোচনীয় স্তরে নেমেছে। সত্যজিতও বিভূতিভূষণকে ভোলাতে কম চেষ্টা করেন নি; ইংরেজিতে পথের পাঁচালীর যে-চিত্রনাট্য তিনি ছেপেছেন তার শীর্ষেই থাকা উচিত ছিলো বিভূতিভূষণের নাম, নিচে ছোটো অক্ষরে সত্যজিতের নাম। কিন্তু তিনি মুছে ফেলেছেন বিভূতিভূষণকে; প্রচ্ছদে বিভূতিভূষণের নাম নেই, পরিচিতি পাতায় নাম নেই, বইয়ের প্রথম পাঁচ পাতার মধ্যেও বিভূতিভূষণের নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। গৌণদের প্রধান হয়ে ওঠার এটা এক মর্মস্পর্শী নমুনা। চলচ্চিত্র এক গৌণ প্রকাশমাধ্যম, এর প্রধানেরাও গৌণ; সিনেমার সাথে শেক্সপিয়রের নাটকের তুলনা করতে পারেন শুধু আজফার হোসেনের মতো মূঢ়রা।

যদিও আজফার হোসেন পশ্চিমবিদ্বেষী, পড়াশুনো ঠিকমতো করেন না, তবু নিজের অহমিকাসম্ভোগের জন্যে নাম নিলেই তিনি লকাঁ, ব্লেক, গ্যালিলিও, শেক্সপিয়র, দেরিদা আবৃত্তি করেন; এ-মহান বাঙালি তাঁর অপরচনাটিতে একটিও বাঙালির নাম নেন নি। পশ্চিমা-নাম-রোগ থাকে অপশিক্ষিতদের, ওই রোগে আজফার হোসেন মুমূর্ষু। তিনি একরাশ নারীবাদীর নাম করেছেন, যাঁদের আমি পড়ি নি বলে তিনি নিশ্চিত, কিন্তু তিনি পড়ে একশেষ করেছেন। ওই নামগুলো তিনি তুলেছেন কোনো বইয়ের রচনাপঞ্জি থেকে, আর আমার রচনাপঞ্জিতে ওই নামগুলো না দেখেই পাগল হয়ে গেছেন। আমি তাঁদের পড়েছি কি পড়ি নি, তা বলা অপ্রয়োজনীয়; শুধু বলা প্রয়োজনীয় যে তাঁদের অনেকেরই আমার লেখা পড়া

বেশ জরুরি। আজফার হোসেন ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কেও কথা বলেছেন, যা সম্পর্কে তাঁর ধারণা চমস্কির শেষনামেই সীমাবদ্ধ। ভাষাবিজ্ঞানে আমি অগ্রসর হতে পারি নি, এটা ঠিক; আজফার হোসেনদের দ্বারা পরিবৃত থেকে অগ্রসর হওয়া খুবই কঠিন; কিন্তু ওই যে Pronominalization in Bengali নামে একটি বই লিখেছি আমি, ওটি পড়ে বুঝতে হলে আজফার হোসেনকে আরেকবার মানুষ হয়ে জন্ম নিতে হবে; তবে এমন দুর্ঘটনা না ঘটাই সভ্যতার জন্যে মঙ্গলজনক।

ভোরের কাগজ সাময়িকী
৩১ বৈশাখ ১৩৯৯

কবি হুমায়ুন আজাদের
বিশেষ সাক্ষাৎকার

হুমায়ুন আজাদ। একাধারে কবি, সমালোচক, ভাষাবিজ্ঞানী এবং প্রাবন্ধিক। বাংলা সাহিত্যের এসব ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্ব স্বীকৃতি পেয়েছে। তিনি খ্যাত বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান প্রথাবিরোধী লেখক হিসেবে। ১৯৮৬ সালে সাহিত্য বিষয়ে পেয়েছেন বাংলা একাডেমির পুরস্কার। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রফেসর হিসেবে তিনি কর্মরত। তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ত্রিশ। মুখোমুখি হই ৭ নভেম্বর ১৯৯২, রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে, তাঁর বিভাগীয় অফিস কক্ষে।

কাগজ : আপনি তো ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে লিখছেন। দীর্ঘ দিনের এ লেখক জীবনে আপনার মনে কখনো প্রশ্ন জেগেছে, কেনো লিখছেন? কিংবা কেনো লেখেন?

হুমায়ুন আজাদ : আমি লিখছি দীর্ঘদিন ধরে, তবে আমার সমস্ত শক্তি কাজে লাগিয়ে লেখা শুরু করেছি ১৯৭৭ থেকে। আমি কেনো লিখি, এ-প্রশ্নের জবাব বারবার দিয়েছি। আমার প্রজাতিটি সৃষ্টিশীল। প্রতিটি মানুষ সৃষ্টিশীলতার কিছুটা বিকাশ ঘটিয়ে যায়; আমি এর বিকাশ ঘটাচ্ছি লেখার মধ্যে দিয়ে। আমার লেখার কয়েকটি ধারা রয়েছে। আমি কবিতা, সমালোচনা, ভাষাবিজ্ঞান, কিশোরদের জন্যে আর সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ক লেখা লিখেছি। প্রতিটি দিকেই মানুষের সৃষ্টিশীলতার বিকাশের চেষ্টা আমার প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। ... লেখক হওয়াটাকে আমি খুব বেশি বড়ো ব্যাপার মনে করি না, অনেকেই লিখতে পারে; আমি গুরুত্বপূর্ণ মনে করি গভীর উপলব্ধি, বোধ এবং সৌন্দর্যচেতনাকে, আর তা প্রকাশের জন্যে আমি লিখি।

কাগজ : এ-জন্যেই আপনি লিখছেন?

হুমায়ুন আজাদ : হ্যাঁ, এ-জন্যেই।

কাগজ : আপনার প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম অলৌকিক ইস্টিমার। এ নামে আপনার একটি কবিতাও রয়েছে। আপনার লেখায় বিদেশি শব্দের ব্যবহার একেবারেই লক্ষ করা যায় না। অথচ আপনার প্রথম কাব্যগ্রন্থের নামে ব্যবহৃত 'ইস্টিমার' শব্দটি ইংরেজি। অন্যদিকে নামটিও কেমন অদ্ভুত। আপনি কী বলেন?

হুমায়ুন আজাদ : আমি ভাষার সূচিতার পক্ষে, তাই সাধারণত বাঙলা লেখার সময় কোনো বিদেশি শব্দ ব্যবহার করি না। আমি চাই, বাঙলা ভাষার শক্তির সীমা কতোটা তা পরীক্ষা করতে। ...অলৌকিক ইস্টিমার গ্রন্থের অনেক কবিতা লিখেছিলাম ছাত্রাবস্থায় এবং কিছু কিছু লিখেছিলাম ছাত্রজীবন শেষ করার পর। এ-কবিতাগুলোর মধ্যে উপলব্ধির চেয়ে আমার আবেগ, দৈনন্দিন জীবনযাপনের আনন্দ, দুঃখ, যন্ত্রণা এবং পরিবেশ বেশি স্থান পেয়েছে। সেজন্যে তখন কথ্যভাষার যে-সমস্ত শব্দ আমি ব্যবহার করতাম, সেগুলোকে আমি কবিতায় ব্যবহার করেছি। 'ইস্টিমার' শব্দটি ব্যবহারের একটি ব্যক্তিগত কারণ রয়েছে। আমাদের বাড়ির কিছু দূরেই পদ্মা নদী। আমি ছেলেবেলা থেকেই মধ্যরাতে পদ্মায় ইস্টিমারের শব্দ শুনে এসেছি। আজো ইস্টিমারের বাঁশির শব্দ শুনতে পাই। জাহাজই বলতে পারতাম। কিন্তু, ইস্টিমার শব্দটি বাল্যকাল থেকে শুনেছি, বলেছি; 'ইস্টিমার' শব্দটি আমার মনে এক বিশেষ আবেগ সৃষ্টি করে। তবে আমি কিন্তু 'স্টিমার' বলি নি। 'ইস্টিমার'কে আর ইংরেজি বলা ঠিক হবে না। বাঙলা ভাষায় আমরা বহু বিদেশি শব্দ এমনভাবে নিয়েছি যে সেগুলো আত্মস্থীকৃত হয়ে গেছে। এ-শব্দগুলো আর বিদেশি শব্দ নয়, এগুলো বাঙলায় পরিণত হয়েছে।

কাগজ : আপনার কি কখনো মনে হয়েছে, আধুনিক বাঙলা কবিতা আঙ্গিকে ও বক্তব্যে অত্যন্ত বেশি মাত্রায় ইউরোপ ও পাশ্চাত্য প্রভাবিত, যা এখনকার এই মুহূর্তের জীবন ও সমাজ বাস্তবতাকে ধারণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

হুমায়ুন আজাদ : আধুনিক বাঙলা কবিতা বা আধুনিক বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে ইউরোপের প্রভাবে। উনিশশতকে আমরা যে আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের সৃষ্টি হ'তে দেখি, যা আমাদের মহৎ সাহিত্য, তা ইউরোপের সঙ্গে বাঙলার লেখকদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলেই সম্ভব হয়েছে। আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের প্রধান লেখকদের সবাই ইউরোপ থেকে ঋণ করেছেন। ইউরোপের ঋণকে তাঁরা পুঁজিতে পরিণত করেছেন। মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সবাই পশ্চিম থেকে বিপুল পরিমাণে গ্রহণ করেছেন। এখন আমরা যাঁদের আধুনিক কবি বলি— বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে— তাঁরা এমন এক নতুন কবিতার ধারা বাঙলা ভাষায় বিকশিত করেন, যা ইউরোপের চিন্তা দ্বারা সমৃদ্ধ। আমি মনে করি বাঙলা কবিতার ইতিহাসে আধুনিক কবিতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ-কবিতায় বাঙলার জীবন, বাঙলার আবেগ আসে নি বলাকে আমি ঠিক মনে করি না। যদি তাঁরা ইউরোপীয় চেতনা না নিতেন, তাহলে আমাদের দেশের কবিতা প্রথাগত ধারার কবিতাই থেকে যেতো, কবিরা জসীম উদ্‌দীন বা বন্দে আলী মিয়ার মতোই কবিতা লিখতেন, সেগুলো কোনো গুরুত্বপূর্ণ কবিতা হতো না। বাংলাদেশের আধুনিক কালে পশ্চিমের চিন্তা, চেতনা, আবেগ গ্রহণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এখন সাহিত্যকে বিশ্বজনীন হ'তেই হবে। আমরা বিষয় নেবো দেশ থেকেই হয়তো, চেতনা হবে আন্তর্জাতিক।

কাগজ : আমাদের দেশের লোকজ উপাদান দিয়ে কি আধুনিক সাহিত্য রচনা করা সম্ভব নয়?

হুমায়ুন আজাদ : সম্ভব। যেমন জীবনানন্দ দাশের রূপসী বাংলা। আমাদের একটি ভুল ধারণা রয়েছে যে আমাদের কবিদের এখনো কবিয়াল হ'তে হবে, এখনো পল্লীকবি হ'তে হবে। পল্লীকবি আর কবিয়াল হওয়ার সময় এখন আর নেই। আমি যদি বাংলার সমাজ, গ্রামীণ জীবন নিয়ে কবিতা লিখি বা উপন্যাস লিখি, তাহলে আমি প্রথাগত উপন্যাস লিখবো না। আমি এ-জীবনকে নতুন চেতনা দিয়ে নতুনভাবে উপস্থাপন করবো। পল্লীর মানুষের দুঃখ, বেদনা, যন্ত্রণা সমস্ত কিছুই গ্রহণ করতে পারি; কিন্তু আমাদের সাহিত্য পল্লীসাহিত্য হবে না, লোকসাহিত্য হবে না। আধুনিক সাহিত্যে তাই করা হয়।

কাগজ : আপনি কি তাহলে বলতে চাচ্ছেন, আমাদের মূল বিষয়বস্তু হ'তে পারে লোকজ উপাদান, কিন্তু তার উপস্থাপন ভঙ্গিটি হবে আধুনিক?

হুমায়ুন আজাদ : অবশ্যই। তবে শুধু লোকজ হ'লেই কোনো কিছু গুরুত্বপূর্ণ হয় না, তার চেতনা ও শিল্পকলাটি কেমন হলো তাই বিশেষ মূল্যবান।

কাগজ : সাম্প্রতিক সময়ে কিছু কবির কবিতার বিশুদ্ধতার নামে আমিত্ব এবং আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে। এতে কবিতা হারাচ্ছে তার শৈল্পিক মান। পাঠকের সাথে কবিতার, কবির আত্মিক সম্পর্ক হয়ে উঠেছে প্রথাসিদ্ধ। কবি-কবিতা-পাঠকের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে বিচ্ছিন্নতার। এ বিষয়ে আপনার কী মনে হয়?

হুমায়ুন আজাদ : সাহিত্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে এগোয়, তার স্বভাব বিভিন্ন সময় বদলে যায়। কবিতায় আমিত্ব হচ্ছে রোম্যান্টিক একটি চেতনা। কবিতার রোম্যান্টিসিজমের উদ্ভবের সময় কবি নিজেই হয়ে ওঠেন কবিতার প্রধান বিষয়। রোম্যান্টিক কবিতার মূলকথা হচ্ছে কবি নিজেই। আমি রোম্যান্টিক কবি, এর অর্থ হচ্ছে, আমার মহাজগতের বা সৌরজগতের আমিই কেন্দ্র, আমিই আমার সৌরজগতের সূর্য। যেমন রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রধান বিষয় রবীন্দ্রনাথ, অর্থাৎ আমি। আমি বিশ্বকে যেভাবে দেখি, উপলব্ধি করি, তাই সত্য; বাস্তব জগতে যা আছে তা সত্য নয়। রোম্যান্টিক কবিতার এটিই হচ্ছে মূলকথা। আমার চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ,— এখানে আমিত্বই প্রধান। আধুনিক কবিতায় আমিত্ব এসেছে আরেকটুকু ভিন্নভাবে, কবি সেখানে কেন্দ্র নয়, কিন্তু বিষয়। কবির 'আমি' আর রাজনীতিবিদের 'আমি' এক নয়। কবি তাঁর 'আমি'র মধ্যে দিয়ে সমগ্র সমাজ, সমগ্র মানবমণ্ডলীকে ধারণ করতে চান। তবে কখনো একান্ত ব্যক্তিগত 'আমি'ও আসে। যেমন, আধুনিক কালে অনেক কবিতা লেখা হয়েছে, যেগুলো স্বীকারোক্তিমূলক, যেখানে কবির নিজের একান্ত ব্যক্তিগত জীবনযাপন বিষয় হয়ে উঠেছে কবিতার।... কবিতায়, শিল্পকলায় 'আমি' দূষণীয় ব্যাপার নয়, যদি তা কবিতা বা শিল্পকলা হয়।

কাগজ : আমাদের দেশসহ সারা বিশ্বে কবিতার সচেতন পাঠকের সংখ্যা কম। একজন কবি কবিতা লেখার পর অধিকাংশ পাঠক যদি সে কবিতার প্রকৃত মর্মার্থ উপলব্ধি করতে না পারে তাহলে কবি এবং পাঠকের মধ্যে একটি শূন্যতার সৃষ্টি হয়। আপনার কি তাই মনে হয়? এবং এই শূন্যতায় কবির মনে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে কিনা?

হুমায়ুন আজাদ : কবি অবশ্যই চান তাঁর কবিতা পাঠকের কাছে পৌঁছাক। যদি তা বিপুল পরিমাণ পাঠকের কাছে পৌঁছায়, তবে তা কবির জন্যে আনন্দদায়ক হতে পারে, নাও হতে পারে। বিপুল পরিমাণ নির্বোধ পাঠকের কাছে পৌঁছানোর চেয়ে গুটিকয়েক রুচিশীল প্রকৃত পাঠকের কাছে পৌঁছানো অনেক বেশি আনন্দদায়ক কোনো কবিতার প্রশংসা করে, তাতে আমি মোটেও উৎফুল্ল বোধ করি না। কবিতা, শিল্পকলায় যে-চেতনা প্রকাশ পায়, বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, তা কোটি কোটি মানুষের কাছে পৌঁছানো সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথাই ধরা যাক। বাংলাদেশের বারো কোটি মানুষের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা পৌঁছেছে দু-তিন লক্ষ মানুষের কাছে। তাও তিনি পাঠ্যপুস্তকের কবি বলে। নইলে তাঁর পাঠক হতো কয়েক হাজার। আমাদের দেশের এগারো কোটি মানুষ লেখাপড়া জানে না। তাদের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের কবিতা অনুভব করা সম্ভব নয়। শিক্ষা ও আর্থিক অবস্থার কারণে এক হাজার পাঠকও মনোযোগ দিয়ে কবিতা পড়ে না। কাজেই কবিতা বিপুল জনগণের কাছে যাবে, এটা একটা কিংবদন্তি মাত্র। শুধু কবিতা কেনো, ভালো শিল্পসাহিত্যের কিছুই বিপুল জনগণের কাছে পৌঁছোয় নি। জনগণের কাছে পৌঁছেছে দুটি নোংরা জিনিস— একটি সিনেমা, অন্যটি রাজনীতি।

কাগজ : আমাদের দেশের সাম্প্রতিক কবিতা সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কী?

হুমায়ুন আজাদ : বাংলাদেশে গত দু-দশকে অর্থাৎ সত্তর ও আশি দশকে নতুন কোনো গুরুত্বপূর্ণ কবি দেখা দেয় নি। যাঁরা এখন গুরুত্বপূর্ণ কবি, তাঁরা সবাই পঞ্চাশ এবং ষাটের দশক থেকে এসেছেন। সত্তর-আশির দশকে কোনো প্রকৃত কবি দেখা যায় নি। কবিতার এখন দুর্দিন চলছে, পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকের যারা এখনো লিখছেন, তাঁরা কোনো নতুন উপলব্ধির বিকাশ ঘটাতে পারছেন না। আমার বারবার মনে হয়, বাঙলা ভাষা, বাঙালির আবেগ, বাঙালির চেতনা দূষিত হয়ে গেছে। চারদিকে কবিতার মতো যেসব রচনা ছাপা দেখি সেগুলোকে অত্যন্ত কৌতুককর বলে আমার মনে হয়। এগুলো কবিতা তো নয়ই, গদ্য হিসেবেও নিকৃষ্ট। বাঙলা ভাষাকে আমরা এতোই দূষিত করে ফেলেছি যে এ-ভাষায় এখন টসটসে কবিতা লেখা কঠিন।

কাগজ : তরুণ যারা লিখছে, তাদের সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?

হুমায়ুন আজাদ : তাঁরা এখনো ঠিক কবি হয়ে ওঠে নি।

কাগজ : এখনো ঠিক কবি হয়ে ওঠেনি— বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করলে ভালো হতো।

হুমায়ুন আজাদ : তাঁরা আবেগ, উপলব্ধি, চেতনার এমন ভাষিক প্রকাশ ঘটাতে পারে নি, যাকে কবিতা বলতে পারি।

কাগজ : কাব্যের শ্লোগানধর্মিতা কাব্যের শিল্পধর্মিতাকে খর্ব করে। আপনার কী মনে হয়?

হুমায়ুন আজাদ : শ্লোগান কখনো কখনো খুব স্মরণীয় হতে পারে; পৃথিবীতে কয়েকটি শ্লোগান আছে, যা উৎকৃষ্ট কবিতার পংক্তি হিসেবে গণ্য হতে পারে। তবে অসাধারণ শ্লোগানের সংখ্যা পৃথিবীতে খুবই কম। চারদিকে এখন প্রতিদিন অজস্র শ্লোগান শুনতে পাই যাতে শ্লোগানদাতারা বিশ্বাস পোষণ করে না। শ্লোগানের পুনরাবৃত্তি ভাষা ও বিশ্বাসকে, রাজনীতিকে দূষিত করে। কবিতায় তা আরো শোচনীয় হয়ে ওঠে। বাঙলা কবিতায় কবিতার নামে কিছু নিম্নমানের শ্লোগান রচিত হয়েছে। যে কোনো শ্লোগান কবিতার জন্যে ক্ষতিকর। আমাদের শ্লোগানধর্মী কবিতাগুলো নিম্নমানের।

কাগজ : দীর্ঘ নয় বছরের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের সময় এক শ্রেণীর কবির উদ্ভব লক্ষ করা গেছে। এসব কবির কবিতায় শৈল্পিক মান ছিলো যথেষ্ট নিম্ন। এদের কবিতায় স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন কিছুটা উপকৃত হলেও আমাদের কাব্য সাহিত্য উপকৃত হয় নি মোটেও। এসব রচনাকে আমরা কি কবিতা বলবো?

হুমায়ুন আজাদ : না।

কাগজ : বিশ্ব কবিতা অঙ্গনে কার কবিতা আপনাকে আকৃষ্ট করে?

হুমায়ুন আজাদ : সমকালীন বিশ্বের কারো কবিতা বিশেষভাবে আমাকে আকৃষ্ট করে না।

কাগজ : এ-বছর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত কবি ডেরেক ওয়ালকটের কবিতা...।

হুমায়ুন আজাদ : ওয়ালকটের কবিতা আমি পড়ি নি। তবে এর মাঝে তার যে-বিবরণ পড়েছি, তাতে তাঁর কবিতার প্রতি বেশি আগ্রহ বোধ করছি না।

কাগজ : আপনার প্রথম কাব্যগ্রন্থ অলৌকিক ইস্টিমার প্রসঙ্গ। এই বইতে আপনি 'যদি তুমি আসো' নামে একটি কবিতা লিখেছেন। এর কয়েক বছর পর শামসুর রাহমান 'যদি তুমি না আসো' এবং 'যদি তুমি আসো' শিরোনামে দু'টি কবিতা লেখেন। আপনার লেখা 'যদি তুমি আসো' এবং শামসুর রাহমানের লেখা 'যদি তুমি না আসো' কবিতা দু'টির মূলভাব অনেকটা এক। এবং অভিন্ন। এর মধ্যে সৃষ্টিশীলতার কোনো রহস্য কাজ করেছে বলে আপনি কি মনে করেন?

হুমায়ুন আজাদ : আমি সম্ভবত কবিতাটি লিখেছিলাম ১৯৭০-এ। শামসুর রাহমান তাঁর কবিতা দুটো লিখেছিলেন এক দশক পরে। এ-বিষয়টিকে আমি বিস্ময়কর মনে করি। আমি মনে করি না শামসুর রাহমান আমার কবিতা পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে কবিতা দুটি লিখেছেন। একই আবেগ বিভিন্নভাবে বিভিন্নজনের কাছে আসতে পারে। শুধু বলতে পারি আমি যে-আবেগ বোধ করেছি সত্তরে, শামসুর রাহমান তা বোধ করছেন এক দশক পরে।

কাগজ : পঞ্চাশ দশকে আমাদের কথাসাহিত্য ছিলো গ্রামনির্ভর। ষাটের দশকে দেখা গেলো যে কথাসাহিত্যে নগরজীবন প্রধান হয়ে উঠলো। এ ধরনের পরিবর্তনকে আপনি কোন্ দৃষ্টিতে দেখেন?

হুমায়ুন আজাদ : এ-পরিবর্তন ছিলো অবধারিত। আগে গ্রাম ছিলো বাংলাদেশের কেন্দ্র; ক্রমশ নগর হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের কেন্দ্র। বর্তমানে মানবজাতির নিয়তি হচ্ছে নগরকেন্দ্রিক হওয়া। সারা পৃথিবীই এক সময় নগরে পরিণত হবে। তাই কথাসাহিত্য নগরের হবে।

কাগজ : আমাদের দেশের কথাসাহিত্যের গতিপ্রকৃতি আপনার কাছে কেমন মনে হয়?

হুমায়ুন আজাদ : বাংলাদেশের কথা সাহিত্য বেশ দুর্বল। এখন যে-সব উপন্যাস লেখা হচ্ছে তার অধিকাংশকেই আমি উপন্যাস বলে গণ্য করি না। এর একটি জনপ্রিয় ধারা আছে, যার নাম দিয়েছি আমি 'অপন্যাস'। এগুলো সাহিত্য নয়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর পর এখানে যাঁরা লিখেছেন তাঁদের কয়েকজনের কাজ গুরুত্বপূর্ণ, যেমন সৈয়দ শামসুল হক বা রশীদ করিম বা শওকত আলীর কাজ।

কাগজ : বৈষম্য, বর্বরতায় আক্রান্ত এ সমাজে সাহিত্যের প্রতিবাদী রূপ কেমন হওয়া উচিত?

হুমায়ুন আজাদ : বাঙলা সাহিত্য প্রাচীনকাল থেকেই মোটামুটিভাবে প্রতিবাদী; বাঙলা কবিতার সূচনা হয়েছিলো প্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে। বিশশতকেও প্রতিবাদের কবিতা উপন্যাস প্রচুর লেখা হয়েছে। প্রতিবাদ বাঙলা সাহিত্যের

একটি প্রধান প্রবণতা। তবে যতো প্রতিবাদ হয়েছে ততো শিল্পকলা হয়নি। আমাদের এখানে যে-প্রতিবাদী সাহিত্য রচিত হয়, তা বিশেষ সরকারের বিরুদ্ধে। আমি মনে করি প্রতিবাদ হওয়া উচিত প্রথাগত, পিতৃতান্ত্রিক, শোষণমূলক সমাজব্যবস্থা এবং চিন্তাধারার বিরুদ্ধে। এ-প্রতিবাদ হবে ব্যাপক, দার্শনিক প্রতিবাদ।

কাগজ : সাহিত্যে নৈতিকতা, জ্ঞান, বিবেক ও শিল্পের সমন্বয় কি সচেতনভাবে করা সম্ভব?

হুমায়ুন আজাদ : একজন ব্যক্তির পক্ষে সব কিছুর সমন্বয় সাধন কঠিন; পৃথিবীতে এমন কেউ জন্ম নেন নি যিনি সব কিছুর সমন্বয় সাধন করেছেন। বড়ো লেখকদের রচনায় এ কাজ অনেকটা ঘটে থাকে, তবে নৈতিকতার ব্যাপারটি সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে।

কাগজ : সাহিত্যিক কিংবা লেখকের সামাজিক বিচ্ছিন্নভাবে কোন্ দৃষ্টিতে দেখেন?

হুমায়ুন আজাদ : একজন লেখককে সামাজিকভাবে খুব বেশি সমাজের সাথে মিশতে হবে, আমি এটা মনে করি না। যদি কেউ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনা করতে পারেন, সেটা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু তাঁকে মানসিকভাবে সমাজ ও সমগ্র পৃথিবীর সাথে সম্পর্ক রাখতে হবে।

কাগজ : নৈর্ব্যক্তিক শিল্পনিরীক্ষা কি সাহিত্যে সম্ভব?

হুমায়ুন আজাদ : সমগ্র আধুনিক শিল্পকলা নিরীক্ষাধর্মী। নিরীক্ষা ছাড়া নতুন কোনো চেতনা হতে পারে না এবং কোনো কিছু এগুলো পারে না। আমাদের বাঙলা সাহিত্যের সীমাবদ্ধতা হচ্ছে আমরা নিরীক্ষাধর্মী নই। নিরীক্ষা হচ্ছে অগ্রসর হওয়ার পদ্ধতি।

কাগজ : অতি আত্মপ্রচার প্রবণতা কাব্য ও শিল্পকে লিফলেটে পরিণত করেছে বলে অনেকে মনে করেন। আপনার কাছে কী মনে হয়?

হুমায়ুন আজাদ : প্রাচীন কাল থেকে পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষ গোপনে অথবা প্রকাশে চেয়েছে তার কথা সবার কাছে পৌঁছুক। যাঁরা পৃথিবীতে অমর, তাঁদের অমরত্বও প্রচারের কারণে। তবে আধুনিক কালে বিজ্ঞাপনের সাহায্যে অনেক গৌণ ব্যক্তি বিশিষ্ট হয়ে উঠছে। আত্মপ্রচারের মধ্যে মহত্ত্ব এবং ক্ষুদ্রত্ব দু-ই থাকে। মহৎ ব্যক্তি যখন আত্মপ্রচার করেন, তখন তার মধ্যেও মহত্ত্বের ছাপ থাকে; ক্ষুদ্র ব্যক্তি আত্মপ্রচারে থাকে ক্ষুদ্রত্ব।

কাগজ : নারী সম্পর্কে বাংলায় গুরুত্বপূর্ণ ও অদ্বিতীয় বইটি আপনি লিখেছেন। সেখানে মারাত্মকভাবে পুরুষ জাতিকে বিদ্বেষ করা হয়েছে। নারীবাদী লেখক হয়ে পুরুষ জাতি হিসেবে আপনি কি নিজেকে কখনো বিদ্বেষ করেছেন?

হুমায়ুন আজাদ : চিরকালই দেখা গেছে যে পর্যুদস্ত শোষিত মানুষের পাশে শোষকদের মধ্যে যাঁরা মহান তাঁরাও এসে দাঁড়ান। স্টুয়ার্ট মিল, রামমোহন,

বিদ্যাসাগর নারীদের পক্ষে লিখেছেন, আন্দোলন করেছেন; তাঁরা নারী ছিলেন না। আমার বইটি পুরুষবিদ্বেষী নয়, তবে পুরুষের সমালোচনায় মুখর। আমি বইটি লিখেছি একটি শোষিত, পর্যুদস্ত, পরাভূত শ্রেণীর পক্ষে। পুরুষ যে-অপরাধ করেছে, তাতে আমি নিজেকে অপরাধী মনে করি।

কাগজ : সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের দেশে নারীবাদের পক্ষে-বিপক্ষে যাঁরা লিখেছেন তাঁদের লেখা সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কী?

যেমন তসলিমা নাসরিন লিখছেন—

হুমায়ুন আজাদ : তাঁর লেখা বানানো ব্যক্তিগত ক্ষোভ ও আক্রোশ, অশ্লীলতার প্রকাশ।

কাগজ : তাঁর লেখাকে কি নারীবাদী বলবেন না?

হুমায়ুন আজাদ : তাঁর লেখা নারীবাদী অবশ্যই যদিও বিকৃত; নারীবাদী দর্শন না বুঝে লেখা। তিনি নারীর মুক্তির থেকে নিজের স্বার্থ দেখছেন বেশি। এটা অবশ্যই এক ধরনের নারীবাদ-বিকৃত, বাণিজ্যিক নারীবাদ।

কাগজ : আমাদের সাহিত্যের সমৃদ্ধির জন্যে সমালোচনা সাহিত্য গড়ে ওঠা উচিত ছিলো। অথচ দীর্ঘদিন পরেও সমালোচনা সাহিত্য গড়ে ওঠে নি। আপনি এর কারণ কী বলে মনে করেন?

হুমায়ুন আজাদ : আমাদের দেশে কোনো কিছুই সুষ্ঠুভাবে বিকশিত হয় নি। সমালোচনার বিকাশ ঘটেনি এজন্য যে সমালোচনা একই সঙ্গে সৃষ্টিশীল এবং বিশ্লেষণাত্মক একটি কাজ। যিনি সমালোচনা লিখবেন, তিনি প্রধানত বিশ্লেষণধর্মী হবেন; এবং তিনি যদি সৃষ্টিশীল হন তবে সমালোচনা বেশি উৎকৃষ্ট হতে পারে। বাঙালি বিশ্লেষণধর্মী নয়, আবেগপ্রবণ। তারা আবেগের প্রকাশ ঘটাতে পারে, আবেগের ব্যাখ্যা দিতে পারে না। বাঙলা সমালোচনা স্বভাবতই দুর্বল। এর বিকাশ অন্য সমস্ত কিছুর মতোই সুষ্ঠুভাবে ঘটে নি। আমাদের এখানে প্রথাগত, অধ্যাপক সমালোচনার একটি ধারা আছে। তাঁরা সমালোচক বলে গণ্য হন নি। আরেকটি ধারা রয়েছে, যাঁরা সাহিত্য ব্যাখ্যা করে লেখকের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো, তাঁর সৃষ্টিশীলতার মূলসূত্রগুলো উদঘাটন করতে চান; তাঁর সৃষ্টি কতোটা মূল্যবান সেটা তাত্ত্বিক কাঠামো অবলম্বন করে ব্যাখ্যা করতে চান। সমালোচনার এ-ধারাটিই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে এ ধারাটির ঠিক বিকাশ ঘটে নি।

কাগজ : ছোটগল্পের ক্ষেত্রে আমাদের সাহিত্যে শূন্যতা বিরাজ করছে। কেনো এই শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

হুমায়ুন আজাদ : উৎকৃষ্ট ছোটগল্প লেখাতো হয়েছে খুবই কম। এর কারণটি সম্ভবত বাহ্যিক। চারপাশে এমন এক পরিবেশ তৈরি হয়েছে যে পাঠকরা উপন্যাসের মতো লেখা চায়। ছোটগল্প পাঠকদের আর প্রকাশকদের আকৃষ্ট করে না। ফলে লেখকরা ছোটগল্প বাদ দিয়ে উপন্যাস লিখতে আগ্রহ বোধ করেন। তবে এটি বাহ্যিক কারণ, আন্তর কারণ নয়।

কাগজ : আপনি একজন পাঠক হিসেবে আপনার সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে মূল্যায়ন করুন।

হুমায়ুন আজাদ : আমি যদি হুমায়ুন আজাদ না হয়ে তাঁর পাঠক হতাম, তাহলে তাঁর বই গভীর আগ্রহে পড়তাম। তাঁর মূল্যায়ন করতাম এভাবে : কবিতায় তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তবে তাঁর আরো কবিতা লেখা উচিত ছিলো; সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; ভাষাবিজ্ঞানে এখন তিনিই সবচেয়ে ভালো; কিশোরসাহিত্যে তাঁর লেখাই সবচেয়ে শিল্পিত; কলামপ্রবন্ধে উৎকৃষ্টতম, যেমন ভাবেন অন্য পাঠকরা; আর বাংলায় নারীবাদের জননী নেই, জনক রয়েছেন তিনি হুমায়ুন আজাদ।

কাগজ : লেখক হিসেবে মূল্যায়ন করুন।

হুমায়ুন আজাদ : লেখক হিসেবে এখন কিছু বলতে চাই না।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন : শহিদুল ইসলাম মিন্টু
আজকের কাগজ : বৃহস্পতিবার ২৮ কার্তিক ১৩৯৯

এ-সপ্তাহের ব্যক্তিত্ব
ডক্টর হুমায়ুন আজাদ

হুমায়ুন আজাদ এদেশের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। একজন লেখক তাঁর লেখনীর মাধ্যমে যতভাবে নিজের মেধাকে বিকশিত এবং পরিস্ফুটিত করতে পারেন হুমায়ুন আজাদ তার সবটুকুই করতে সমর্থ হয়েছেন। কবি, সমালোচক, ভাষাবিজ্ঞানী, প্রাবন্ধিক এবং কলামিস্ট হিসেবে তাঁর খ্যাতি অসাধারণ। তিনি যেভাবে উচ্চারণ করেন এ-সমাজের রূঢ় বাস্তবতা তা খুব কম লেখকের পক্ষেই সম্ভব। তিনি এদেশের একমাত্র প্রথাবিরোধী লেখক। তিনি অত্যন্ত শাণিত এবং তীক্ষ্ণভাবে বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রতিবাদী ভাষায় ভেঙে ফেলতে চান এই প্রথাগত সমাজের বিধিবিধান। সমাজে যা সত্য এবং প্রায় ক্ষেত্রেই অনুচ্চারিত তাই উঠে আসে তাঁর লেখনীতে। বাঙলা সাহিত্যে একমাত্র তিনিই প্রবচন রচনা করেন, যা পড়ে প্রথাগত সমাজ হঠাৎ ঘা খেয়ে চিৎকার করে ওঠে।

কবিতার ক্ষেত্রে তিনি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল এবং ব্যতিক্রম। কবিতার চিৎকারসর্বস্ব এবং শ্লোগানধর্মী যে-ধারাটি প্রবহমান তা থেকে তিনি সম্পূর্ণ আলাদাভাবে শনাক্তযোগ্য। কবিতার আধুনিকতা এবং নতুনত্ব তাঁর কবিতায় যেভাবে এসেছে তাঁর সমসাময়িক কারো কবিতাই ঠিক ওই ভাবে উঠে আসে নি সে-কারণেই তিনি তাঁর সমসাময়িক কবিদের থেকে আলাদা। ভাষাবিজ্ঞানী হিসেবে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই— একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। সমালোচক হিসেবে তিনি সর্বদাই নিরপেক্ষ এবং বলিষ্ঠ। প্রবন্ধসাহিত্যে তিনি বর্তমান সময়ে সবার শীর্ষে অবস্থান করছেন। রাজনৈতিক কলামিস্ট হিসেবেও তাঁর জনপ্রিয়তা অনস্বীকার্য। ইতিমধ্যে তিনি বাংলা একাডেমী, শিশু একাডেমীসহ আরো অনেক [সত্য নয় : হুআ] পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তিনি ডক্টরেট করেছেন ভাষাবিজ্ঞানে।

হুমায়ুন আজাদের প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে রয়েছে [কবিতা] অলৌকিক ইস্টিমার, জ্বলো চিতাবাঘ, সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে, যতোই গভীরে যাই মধু যতোই ওপরে যাই নীল, আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে; [সমালোচনা/প্রবন্ধ] নারী, শামসুর রাহমান/নিঃসঙ্গ শেরপা, শিল্পকলার বিমানবিকীকরণ, ভাষা

আন্দোলন; সাহিত্যিক পটভূমি, আধার ও আধেয়, প্রতিক্রিয়াশীলতার দীর্ঘ ছায়ার নিচে, নিবিড় নীলিমা, মাতাল তরণী, নরকে অনন্ত ঋতু, জলপাইরঙের অন্ধকার; [ভাষাবিজ্ঞান]

Pronominalization in Bengali, বাক্যতত্ত্ব, বাঙলা (দু-খণ্ড, প্রধান সম্পাদক), বাঙলা ভাষার শত্রুমিত্র, তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান; (কিশোরসাহিত্য) লাল নীল দীপাবলি বা বাঙলা সাহিত্যের জীবনী, কতো নদী সরোবর বা বাঙলা ভাষার জীবনী, ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না, আব্বুকে মনে পড়ে। বাঙলা ভাষায় অভিনব একটি বই লিখেছেন তিনি, নাম হুমায়ুন আজাদের প্রবচনগুচ্ছ। এবার মেলায় বেরিয়েছে হুমায়ুন আজাদের শ্রেষ্ঠ কবিতা, প্রবন্ধের বই সীমাবদ্ধতার সূত্র, কিশোরদের জন্যে প্রবন্ধ-কবিতা-গল্পের সংগ্রহ বুকপকেটে জোনাকিপোকা।

কাগজ : মধ্যষাটের দশকে কবি হিশেবে আপনার আত্মপ্রকাশ ঘটলেও আপনার প্রথম কাব্যগ্রন্থ অলৌকিক ইস্টিমার বেরোয় সত্তর দশকের দিকে, এই বিলম্বের কি বিশেষ কোনো কারণ ছিলো?

হুমায়ুন আজাদ : আমি কিশোর বয়স থেকেই লিখছি, তবে কবি হিশেবে আমি নিজেকে মনে করি ষাটের দ্বিতীয়ার্ধের। ছাত্রজীবনে আমি যা কিছু লিখেছি তা সাহিত্যের জন্যে ভালোবাসার কাতর প্রকাশ, সেগুলোকে আমি বইয়ে ধরতে চাই নি। ছাত্রজীবনে আমি যে-পরিমাণ গদ্য লিখেছি, তাতেও কয়েকটি বই হতে পারে; কিন্তু সে-সব লেখাকে আমি বাতাসে উড়িয়ে দিয়েছি, কেউ একদিন খুঁজে নেবে। আমি কবিতা সব সময়ই কম লিখেছি, এবং ছাত্রজীবনে কখনো আমার বই বের করার ইচ্ছে হয় নি। স্বাধীনতার পর আসে এক উচ্ছল কবিতার কাল, তখন অনেকের মতো বেরোয় আমারও বই। আমার প্রথম বই দেরিতে বেরোয় নি, ১৯৭৩-এ যখন আমি ছাব্বিশ তখন বেরোয় অলৌকিক ইস্টিমার। এটাই আধুনিকের আত্মপ্রকাশের ঠিক বয়স।

কাগজ : আপনি যে-দশকে বাক্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন সে-সময়ে 'স্যাড জেনারেশন' নামে একটা জেনারেশন নতুন ধারার কাব্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছিলো বলে তাঁরা দাবি করেন, ঐ জেনারেশন কী? তাঁরা কি কাব্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে কোনো নতুন মাত্রা যোগ করতে পেরেছিলেন? আপনি তার সাথে যুক্ত ছিলেন কিনা?

হুমায়ুন আজাদ : স্যাড জেনারেশন কোনো আন্দোলন নয়, ওটা ছিলো কয়েকজন তরুণের কাম ও কবিতার ক্ষণউত্তেজনা। আমি নিউপ্রিন্টে ছাপা তাঁদের একটি প্রচারপত্রিকা দেখে খুব মজা পেয়েছিলাম। যাঁরা লেখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে রফিক আজাদ ছাড়া আর কেউ কবি হন নি। ওই নিউজপ্রিন্টিংটায় প্রশান্ত ঘোষাল চম্পাবতী নামের এক কাব্যিক বেশ্যাকে উদ্দেশ করে ইংরেজিতে লিখেছিলেন

একটি চমৎকার রচনা, বলেছিলেন তাঁর চারপাশের তরুণীরা Foxy and sexy, donot know the meaning of life। স্যাড জেনারেশনের প্রেরণা ছিলেন বুদ্ধদেব বসুর বোদলেয়ার, যাতে কাম ও কবিতা উজ্জ্বল ধাতুর মতো জ্বলে উঠেছিলো আমাদের চোখের সামনে। ওটা আন্দোলন নয়, কোনো নতুন মাত্রাও যোগ করে নি। ওই প্রজন্মে ছিলেন আমার থেকে চার-পাঁচ বছরের বড়োরা, ক্লাসের থেকে পতিতাপল্লীকেই যাঁরা জ্ঞানার্জনের জন্যে বেশি উপযুক্ত বলে মনে করতেন। আমি ছিলাম অনেক দূরে।

কাগজ : ষাটের দশকে সুস্থ কাব্যচর্চার জন্যে বিরুদ্ধ পরিবেশ বর্তমান ছিলো, সে-পরিবেশকে একজন সচেতন এবং সফল কবি হিসেবে আপনি কতোটুকু কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন কিংবা নিজেকে তা থেকে কতোটুকু বিচ্ছিন্ন রাখতে পেরেছিলেন?

হুমায়ুন আজাদ : ষাটের দশকের পরিবেশ সুস্থ কাব্যচর্চার বিরুদ্ধে ছিলো না, সুস্থ কাব্যচর্চা কাকে বলে? ষাটের দশকে আমরা একটা বড়ো একনায়কের অধীনে ছিলাম, তবে ওই দশকেই বাঙালি মুসলমান ভালোভাবে বাঙালি হতে থাকে; এবং আধুনিকতা আয়ত্ত করে। আধুনিকতা ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; যে-আধুনিক চেতনা অমুসলমান বাঙালি লেখকদের মধ্যে জাগে বিশের দশকের মাঝামাঝি তা বাঙালি মুসলমানের মধ্যে দেখা দেয় ষাটের দশকে। পঞ্চাশের দশকের শুরুতে ভাষা-আন্দোলন ঘটে, কিন্তু তার ফল ফলতে শুরু করে ষাটের দশকে; আমাদের সাহিত্য, বিশেষ করে কবিতা এ-দশকেই আধুনিকত্ব অর্জন করে, যা আগে হয় নি। তখন পাকিস্তানি কবিরা প্রায় মরে গেছে; পাকিস্তান ছিলো অনাধুনিকতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতা, ষাটের দশকেই দেখা দেয় প্রকৃত আধুনিক চেতনা ও প্রগতিশীলতা। আমি বাল্যকাল থেকেই, সহজাতভাবেই ছিলাম আধুনিক চেতনাসম্পন্ন। যা কিছু আধুনিক নয়, তা আমি বাদ দিয়েছি; আর বাঙলা ভাষার পরিস্রুতির কাজটি আমি করেছি শুরু থেকেই, আমার লেখা থেকে আরবিফারসি সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে। ষাটের লেখকদের রচনা ভালোভাবে বিশ্লেষণ করলে ধরা পড়বে যে চেতনাগত আধুনিকতা আমার লেখায়ই বেশি ধরা পড়েছে। আমাদের আধুনিকদের মধ্যেও অনেকে অনাধুনিক চেতনা লালন করেন, এমনকি শামসুর রাহমানও করেন, আমি আমার লেখায় কোনো অনাধুনিক চেতনার ছোঁয়া রাখি নি। আধুনিকতাকে গ্রহণ করেই আমি পাকিস্তানি, এমনকি বাঙালির সীমাবদ্ধতাকেও কাটিয়ে উঠতে চেয়েছিলাম।

কাগজ : ষাটের দশকের অনেক গৌণ কবিকেই বড়ো কবি বলে দেখা হয়, একে আপনি কিভাবে দেখেন; তাঁদের পাশাপাশি আপনার অবস্থানকে কিভাবে চিহ্নিত করবেন?

হুমায়ুন আজাদ : ষাটের দশকের কবিরা কেউ প্রধান কবি নন, তবে কেউ কেউ কবি হিসেবে খুব নাম করেছেন। এ-নামের পেছনে কবিতার থেকে অকবিতাই বেশি রয়েছে। যে-কয়জনের নাম বেশি শোনা যায়, তাঁদের অধিকাংশের কবিতাই তুচ্ছ, রাজনীতিক বা অন্য কোনো অকাব্যিক কারণে নাম হয়েছে তাঁদের। আমার কবিতা তাঁদের কবিতার থেকে সত্যিই উৎকৃষ্ট, পাঠকদের আমি পড়ে দেখতে বলি; কিন্তু আমি যেহেতু কবিতাকে ট্রেডমার্ক করি নি, নানা দলে যোগ দিই নি, বছরে বছরে বই বের করি নি, এবং লিখেছি প্রচুর গদ্য, তাই আমার কবিতা প্রাপ্যমূল্য পায় নি। আমি লিখেছি নানা ধরনের লেখা; আমি সম্ভবত আমার বয়সের, এমনকি আমার থেকে পনেরো-বিশ বছর বয়সের বড় লেখকদের থেকেও বেশি শব্দ ও বাক্য লিখেছি; আমি যেহেতু লিখেছি কবিতা' থেকে অনেক দূরবর্তী দুরূহ কিছু বই, আমার নামের সঙ্গে রয়েছে একটি ডক্টর একটি প্রফেসর, তাই ঢাকার চাষিসমাজ প্রথমেই ধরে নেয় কবি হওয়া আমার সাজে না। ভালোভাবে বিচার করলে বোঝা যাবে ষাটের দ্বিতীয়ার্ধের জনপ্রিয়রা অনেক নিকৃষ্ট কবি আমার থেকে।

কাগজ : পঞ্চাশের দশকের কথাসাহিত্য ছিলো মূলত গ্রামনির্ভর, ষাটের দশকে এসে তা বাঁক নিলো শহরের দিকে এবং নগরকেন্দ্রিক সাহিত্য হিসেবে পরিচিতি পেতে লাগলো। ষাটের কথাসাহিত্যের এই পালাবদলের পেছনে কি কোনো শক্তিশালী কারণ ছিলো?

হুমায়ুন আজাদ : বাংলাদেশ এখনো একটি গ্রাম, তবে নগরই মানুষের নিয়তি। ষাটের দশকের উপন্যাসে নগর ঢুকেছে দুটি প্রধান কারণ; কথাসাহিত্যিকদের নাগরিক অভিজ্ঞতাই ছিলো বেশি, আর তাঁরাও কবিদের মতোই আয়ত্ত করতে চেয়েছিলেন আধুনিকত্ব। উপন্যাসকে পল্লীর বা নগরের উপন্যাস বলে চিহ্নিত করা ঠিক নয়, দেখা দরকার ভেতরের চেতনাটি। নগর নিয়েও গ্রাম্য উপন্যাস অনেকে লিখেছেন, আর পল্লী নিয়েও, যেমন ওয়ালীউল্লাহ, লিখেছেন আধুনিক উপন্যাস।

কাগজ : আপনার কবিতায় উপমা ও চিত্রকল্প যেভাবে এসেছে তা খুব কম কবির কবিতায়ই উপস্থিত। এই দিক থেকে আপনি একজন সফল কবি, তা সত্ত্বেও আপনি হঠাৎ করে কবিতা লেখা ছেড়ে দিলেন বলে মনে হচ্ছে, কারণ ইদানীং কোনো পত্রপত্রিকায় আপনার কবিতা চোখে পড়ছে না। ইতিমধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ কবিতার বইও বের করেছেন। আপনি কি মনে করেন কাব্যক্ষেত্রে আপনার যা দেবার তা দেয়া হয়ে গেছে?

হুমায়ুন আজাদ : আমি শুধুই কবি নই, যদিও আমার সমস্ত রচনায়ই আমার কবিসত্তার পরিচয় মিলবে। কয়েক বছর আমি প্রচুর গদ্য লিখেছি। সমালোচনা, ভাষাবিজ্ঞান বা কলামপ্রবন্ধ লিখতে আমার বেশ সময় ব্যয় হয়েছে। কবিতা

লেখার জন্যে যে আন্তর কৃষি দরকার, তার সময় পাই নি; বা আমার মনে হয়েছে গদ্য লেখাটাই বেশি জরুরি। আমি এ সময়ে কবিতা লিখি নি, অনেকে লিখেছেন; তাতে কিছু আসে যায় না, কেননা গত দু-দশকে যাঁরা কবিতা লিখেছেন, তাঁদের অধিকাংশ রচনাই কবিতা হয়ে ওঠে নি। ওগুলো কবিতার অনুকরণ। বাঙলা ভাষা ও উপলব্ধিকে আমরা বড়ো বেশি দূষিত করে ফেলেছি, তাই প্রকৃত কবিতার জন্যে দরকার আবেগ, উপলব্ধি ও ভাষার পরিস্মৃতি। আমি মনে মনে তার জন্যে তৈরি হচ্ছি। আমার কী দেয়ার আছে, আমি তা জানি না; তবে আরো কবিতা বেরোবে আমার ভেতর থেকে।

কাগজ : বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে মাত্র দুবার বিশেষ পালাবদল ঘটেছে, একবার মধুসূদনের হাতে, দ্বিতীয়বার তিরিশের পাঁচ কবির হাতে। এর পর কবিতার ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো পরিবর্তন এসেছে বলে আপনি মনে করেন?

হুমায়ুন আজাদ : আধুনিক কালে দু-বার নয়, তিনবার বড়ো পালাবদল ঘটেছে বাঙলা কবিতার। মধুসূদন ও আধুনিকদের মধ্যে রয়েছেন বিহারীলাল—রবীন্দ্রনাথ। মধুসূদন যে-পালাবদল ঘটিয়েছিলেন, সেটা ছিলো ভূমিকম্পের মতো; ঈশ্বর গুপ্তের পর মধুসূদন সুস্পষ্টভাবে ভিন্ন ও সাড়াজাগানো। কিন্তু বিহারীলাল সাড়া জাগান নি, তাঁর ভিন্নতা বুঝতে অনেক সময় লেগেছিলো; বাঙালি এটা ভালোভাবে বুঝতে পারে রবীন্দ্রনাথ দেখা দিলে। রবীন্দ্রনাথের পর তিরিশিরা যে-পরিবর্তন ঘটান, সেটা ভূমিকম্প ছিলো না; ধীরে ধীরে তাঁরা সৃষ্টি করেন নতুন কবিতা। তাঁরাই প্রথম বাঙলা ভাষায় লেখেন বিশশতকের কবিতা, রবীন্দ্রনাথ বা নজরুলের কবিতা বিশশতকের কবিতা নয়, তা উনিশশতকের। তিরিশিরা বদল ঘটান চৈতন্যের, সংবেদনশীলতার, ভাষার। এরপর প্রতি দশকে ধীরে ধীরে বিকাশ ঘটেছে বাংলা কবিতার। শিল্পকলার ক্ষেত্রে বিপ্লব দশকে দশকে ঘটে না, ঘটতে সময় লাগে। তিরিশিরা যার সূচনা ঘটিয়েছিলেন আমরা এখন তার মোহনায় এসে গেছি। নতুন কবিতার জন্যে দরকার কালের আনুকূল্য ও প্রতিভা, যার অভাব দেখা যাচ্ছে এখন।

কাগজ : এ-সময়ে তরুণরা যাঁরা কবিতা লিখছেন, তাঁরা বারবারই দাবি ক'রে আসছেন যে কবিতার ক্ষেত্রে তাঁরা নতুন কিছু একটা দিতে পেরেছেন। তাঁদের মন্তব্যের সাথে আপনি একমত পোষণ করেন কিনা?

হুমায়ুন আজাদ : নির্দ্বিধায় বলতে পারি? এমন কেউ দেখা দেন নি এ-সময়ে। তাঁদের দাবি শুনি, তাঁরা প্রত্যেকে নিজেকে প্রশংসা করেন, তাও জানি; কিন্তু তাঁদের লেখা কবিতা হয়ে ওঠে না। কিন্তু আমি নতুন কবির প্রতীক্ষায় আছি।

কাগজ : অনেক কবিই শ্লোগানসর্বস্ব কবিতা লিখে বাজার মাত করার চেষ্টা করছেন, এই ধরনের কবিতাকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন? একজন কবির মানস কিভাবে গড়ে ওঠা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

হুমায়ুন আজাদ : উৎকৃষ্ট শ্লোগান সৃষ্টিও প্রতিভার কাজ; বাংলাদেশে যে-সব শ্লোগান চলে সেগুলো নষ্ট রাজনীতির নষ্ট শ্লোগান, অসৎ নিরর্থক ক্লিশে। কবিতায় চিরকালই বহু ভুল লোক ঢুকে পড়ে; আর রাজনীতিক কবিতার প্রবলতার কালে কবিতায় ভুল লোক ঢুকেছে ও ঢুকছে বেশি ক'রে। যাদের কাজ ছিলো দেয়ালে শ্লোগান লেখা, নেতার স্তুতি ও প্রতিপক্ষের নেতার নিন্দা করে মিছিল করা, তাদের অনেকেই আজকাল কবিতায় ঢোকে। যে-তরুণতরুণীদের কোনো ধরনের প্রতিভাই নেই, তারাই মনে করে তাদের রয়েছে কবিপ্রতিভা; রাজনীতিক কর্মীদের সংখ্যা তাদের মধ্যে বেশি। প্রতিভাহীন মানুষ করতালি খুব পছন্দ করে, তাই তারা কবিতার নামে লেখে করতালিপাগল আবর্জনা। কবির থাকা দরকার সহজাত কবিপ্রতিভা, এবং ওই প্রতিভাকে কাজে লাগানোর মতো শিক্ষা; অশিক্ষিতের পক্ষে আর বড়ো কবি হওয়া সম্ভব নয়।

কাগজ : আপনার ভাষায় যাঁরা 'অপন্যাস' লিখে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন, তাঁদের এ-জনপ্রিয়তাকে আপনি কোন্ দৃষ্টিতে দেখেন? এঁদের লেখার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু বলুন।

হুমায়ুন আজাদ : অপন্যাস হচ্ছে এমন কাহিনীসাহিত্য, যা লেখা হয় অবিকশিত মগজহীন পাঠকদের জন্যে। এর একমাত্র লক্ষ্য বিক্রি হওয়া। এর লেখকেরা তথাকথিতভাবে 'জনপ্রিয়'। অপন্যাসের কোনো সাহিত্যমূল্য নেই, ভবিষ্যৎ নেই, এর সবটাই বর্তমান ও টাকা। অপন্যাস উপসংস্কৃতি বা সাবকালচারের অংশ। মানুষ বিনোদন চায়; সাধারণ সাক্ষর সমাজে বিপুল পরিমাণ সদস্য থাকেন যাঁরা কাহিনী পড়ে আনন্দ পেতে চান; শিল্পসাহিত্যের তাঁরা ধার ধারেন না, তাঁরা চান মজা বা আনন্দ। প্রত্যেক সমাজেই এ-শ্রেণীর সদস্যসংখ্যা বেশি, তাই অপন্যাস দরকার প্রত্যেক দেশেই। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যশিল্পকলা সকলের পক্ষে উপভোগ করা সম্ভব নয়, তাদের জন্যে অপন্যাস

দরকার। অপন্যাস লেখক অবিকশিত পাঠকদের কাছে জনপ্রিয় থাকবেন, টাকাও আয় করবেন, কিন্তু ঔপন্যাসিক হবেন না। ইংরেজি ভাষায় বহু অপন্যাসিক রয়েছেন, তাঁদের আয় লোমহর্ষক, কিন্তু তাঁরা লেখকের মর্যাদা পান না। আমাদের অশিক্ষিত সমাজে অপন্যাসিকেরাও লেখকের মর্যাদা পান, ভালো লেখকেরা তাঁদের ঈর্ষা করেন।

কাগজ : আপনি উপন্যাস লেখায় হাত দেবেন বলেছিলেন, অথচ এখনো লেখা শুরু করেন নি বলে শোনা যায়। এর কারণ কি? নিজেকে এখনো গুছিয়ে নিতে পারেন নি?

হুমায়ুন আজাদ : এ-বছর হয়তো লিখবো।

কাগজ : গত তিন দশকে প্রবন্ধসাহিত্য তেমন এগোয় নি, সৃষ্টিশীল ভালো প্রবন্ধ ইদানীং লেখা হচ্ছে না। প্রবন্ধসাহিত্যের এ-বন্ধ্যাত্বের পেছনে আপনি কি কি কারণকে চিহ্নিত করবেন?

হুমায়ুন আজাদ : প্রবন্ধের প্রাণ হচ্ছে 'আইডিয়া' বা মৌলিক চিন্তা; কিন্তু বাঙালির মৌলিক চিন্তা বিশেষ নেই। আমাদের প্রধান প্রাবন্ধিকদের সমস্ত আইডিয়াই পশ্চিম থেকে নেয়া। মৌলিক আইডিয়া যখন মৌলিক গদ্যে প্রকাশ পায়, তখনি জন্মে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। বাংলাদেশ এখন ব্যস্ত রাজনীতিক-সামাজিক উপসম্পাদকীয় নিয়ে, বাংলাদেশ এখন গলগল করে বলছে বায়ান্ন আর একাত্তরের রূপকথা। এর জন্যে চিন্তা ও ভাষা দরকার পড়ে না; তাই প্রবন্ধ নেই।

কাগজ : সমালোচনা সাহিত্য কি বা অনুবাদ সাহিত্যে আমাদের দেশের লেখকদের তেমন আগ্রহ নেই কেন? এই দুই ধারায় সাহিত্যের উপযোগিতা কম, নাকি যোগ্য লেখকের অভাব?

হুমায়ুন আজাদ : যে-সমাজ বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নবিমুখ, সেখানে সমালোচক দেখা দিতে পারেন না; স্তাবক দেখা দিতে পারেন। অনুবাদ করার জন্যে অন্তত দুটি ভাষা ভালোভাবে জানা দরকার। বাংলাদেশে একটি ভাষাই ভালোভাবে জানেন না অধিকাংশ লেখক, সেখানে অনুবাদ সাহিত্যের বিকাশ ঘটবে কীভাবে?

কাগজ : সম্প্রতি আপনার নতুন প্রবচন পড়ে মনে হলো আপনি রমণীর দেহকে পুরুষদের জন্যে অনিবার্য করে তুলেছেন এবং তাকে পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান জিনিসের চেয়েও কাঙ্ক্ষিত মনে করছেন। এর কারণ কী?

হুমায়ুন আজাদ : এ-প্রশ্নটি ভুল বোঝার এবং পুরুষাধিপত্যের প্রকাশ। আমি বলেছি 'শরীরই শ্রেষ্ঠতম সুখের আকর। গোলাপের পাপড়ির ওপর লক্ষ বছর শুয়ে থেকে, মধুরতম দ্রাক্ষার সুরা কোটি বছর পান করে, শ্রেষ্ঠতম সঙ্গীত সহস্র বছর উপভোগ করে যতোখানি সুখ পাওয়া যায়, তার চেয়ে অর্বুদগুণ বেশি সুখ মেলে কয়েক মুহূর্ত শরীর মন্থন করে।' আমি বলেছি শরীরের কথা, রমণীয় শরীরের কথা আমি বলি নি। তুমি পড়েছো এটা প্রথাগত পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে, যেনো শরীর মন্থন করে পুরুষই সুখ পায়, আর মন্থন করে নারীর শরীর। নারীপুরুষ দুজনেই মন্থন করতে পারে পরস্পরকে, এমনকি নিজেকেও।

কাগজ : আমরা আপনাকে বাংলাদেশে নারীবাদী আন্দোলনের জনক হিসেবে মনে করে থাকি। এই মনে করাটাকে আপনি যুক্তিসঙ্গত মনে করেন কিনা?

হুমায়ুন আজাদ : বাঙলায় ধ্রুপদী নারীমুক্তি আন্দোলনের দুই জনক রামমোহন ও বিদ্যাসাগর; আমি বাঙলা ভাষায় প্রকাশ করেছি আধুনিক নারীবাদের ইশতেহার। বিষয়টি আমি তাত্ত্বিকভাবে আলোচনা করেছি, এবং এমন একটি বই লিখেছি, যার গুরুত্ব ভবিষ্যতে আরো বেশি স্বীকৃত হবে। জনক? শব্দটি আমার কাছে লৈঙ্গিক ভাবাপন্ন মনে হয়।

কাগজ : একজন প্রথাবিরোধী লেখক হিসেবে আপনাকে অনেকেই ঈর্ষা করে, আবার ভয়ও করে, সে ক্ষেত্রে আপনি বিতর্কিত বটে। আপনি কি মনে করেন?

হুমায়ুন আজাদ : ঈর্ষা করে? তাহলে খুব ভালো, প্রথাবিরোধী লেখক দেখা দেবেন তাহলে। ভয় যারা করে, তারা নিশ্চয়ই কোনো অপরাধ বা স্বার্থের সাথে জড়িত। বিতর্কিত? প্রথাবিরোধীরা চিরকালই বিতর্কিত, যদিও তারাই পৃথিবীকে মানুষের উপযুক্ত করে রাখে।

কাগজ : একজন সফল ভাষাবিজ্ঞানী হিসেবে বাঙলা ভাষার সঠিক ব্যবহার এবং তার প্রয়োগ কেমন হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

হুমায়ুন আজাদ : বাঙলা ভাষাসমাজ মোটামুটি অশিক্ষিত, যারা শিক্ষিত তারাও যথার্থ শিক্ষিত নয়। তাই বাঙলা ভাষার মান, বাংলা ভাষার বিশুদ্ধ প্রয়োগ বাংলাদেশে বেশ দুর্বল। আমাদের রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করে সাধারণত অর্ধশিক্ষিত শক্তিমানেরা, তারা ভাষার কথা ভাবার সময় পায় না, যদিও এ নিয়ে কথা বলে। এখন দরকার বাঙলা ভাষার একটি বিস্তৃত ব্যাকরণ রচনা, এবং অন্যান্য ভাষিক শৃঙ্খলা বের করা। যদি একদিন রাজনীতি সুস্থ হয়, দেশ শিক্ষিত হয়, তখন এ-বিষয়ে ভাবা যাবে।

কাগজ : সবচেয়ে হাস্যকর কথা হচ্ছে একদিন আমরা কেউ থাকবো না—আপনার ভেতরে এই মূল্যবান দার্শনিক চিন্তা কাজ করার কারণ কি? তাহলে আপনি কি মৃত্যুকে নিয়ে ভাবেন?

হুমায়ুন আজাদ : মৃত্যুকে কেউ ভুলে থাকতে পারে না, আমি তো শিশুকাল থেকেই ভাবি। ভয়ে ছেলেবেলায় মাকে জড়িয়ে ধরতাম। যৌবনে চারদিকে দেখতাম মৃত্যুর মুখ, তাকে এড়ানোর জন্যে তাকাতাম সৌন্দর্যের দিকে। এখন অভিজ্ঞ হয়েছি, জীবনের সারকথা অনেকটা বুঝেছি, এখন মৃত্যুর কথা ভাবলে সভ্যতা শিল্পকলা বিজ্ঞানকে হাস্যকর মনে হয়। তবু নিরর্থকতাকে অর্থময় করতে চাই শব্দে ও বাক্যে। সম্প্রতি আমি একগুচ্ছ কবিতা লিখেছি, নাম 'হুমায়ুন আজাদের মৃত্যুভারাতুর কবিতাগুচ্ছ'। আমরা শূন্যতার মধ্যে আছি, শূন্যতার দিকে এগোচ্ছি, যেখানে 'পশুর পায়ের দাগ আর ফুল একই অর্থবহ।'

খবরের কাগজ
১২ বর্ষ ৮ সংখ্যা ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, ১১ ফাল্গুন '৯৯

হুমায়ুন আজাদের সাক্ষাৎকার

মারুফ রায়হান : আমাদের সাক্ষাৎকারটা শুরু করতে চাচ্ছি এভাবে যে পৃথিবীতে অনেক ধরনের কাজ আছে, এতো অজস্র কাজ থাকতে, লেখালেখি করবেন এমন সিদ্ধান্ত নেয়ার পেছনে গূঢ় কোনো কারণ কি ছিলো?

হুমায়ুন আজাদ : আমি যা হয়েছি, তা হওয়া আমার জন্য অবধারিত ছিলো। 'লেখালেখি' শব্দটি আমার পছন্দ নয়; আমি যা করি, তাকে আমি 'লেখালেখি' বলে গণ্য করি না। প্রথাগতভাবে যাকে লেখক হওয়া বলে, যার কাজ বই বা নানা কিছু লেখা, বিনোদন করা, জনপ্রিয় হওয়া, আমি তা হতে চাই নি; তা হই নি। আমি চেয়েছিলাম এমন কিছু প্রকাশ করতে, এবং সৃষ্টি করতে, যা অবধারিতভাবে প্রকাশ পায় লেখারূপে; তাই আমি লেখক বলে পরিচিত। তবে আমি যা করি, তা 'লেখালেখি' নয়; লেখক হওয়া আমার পেশা নয়। পেশায় আমি অধ্যাপক। অন্যান্য পেশায়ও আমি যেতে পারতাম, যে-কোনো পেশায় সফল হওয়ার যোগ্যতা আমার ছিলো। আমি কিছু প্রকাশ ও সৃষ্টি করতে চেয়েছি, এটা জন্মগত; আমার প্রকাশের সৃষ্টির মাধ্যম ভাষা, যা অন্যের কাছে আজকাল প্রধানত লিখেই জ্ঞাপন করতে হয়। 'লেখালেখি' বলতে যা বোঝায়, তা আমি করতে চাই নি, করি না। মানুষ সৃষ্টিশীল, তবে সব মানুষ তার সৃষ্টিশীলতাকে কাজে লাগায় না; অধিকাংশ মানুষ জীবনযাপন করেই নিঃশেষ হয়ে যায়। আমার ভেতরের সৃষ্টিশীলতাকে আমি অনিবার্যভাবে ব্যবহার করেছি; আমি সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে, উপলব্ধি প্রকাশ করতে চেয়েছি, চেয়েছি ভাষ্য রচনা করতে; এটা ঘটেছে অনেকটা অবধারিতভাবে। পেশার কথা ধরলে বাংলাদেশের যে-কোনো আকর্ষণীয় পেশায় ইচ্ছে করলেই আমি যেতে পারতাম, সফলভাবে তা সম্পন্নও করতে পারতাম। অন্য কোথাও ব্যর্থ হয়ে আমি 'লেখালেখি'তে আসি নি বা লেখক হই নি, অন্য কোথাও যাওয়াই হতো আমার ব্যর্থতা। লেখার জন্যে যতোটা পরিশ্রম করি, মেধাপ্রতিভার কথা ছেড়েই দিচ্ছি, তার সিকিভাগ ব্যয় করে বাংলাদেশে যে-কোনো পেশার শীর্ষে ওঠা যায় সহজে।

মা রা : সেদিন আপনি যে-লেখাটি লিখলেন আমাদেরই কাগজে সেখানে আপনি বলেছেন, 'আমার কোনো বইয়ের জন্য আমার মোহ নেই। জানি কিছুই টিকে থাকবে না-কিন্তু অলৌকিক ইস্টিমার নামে যে শিহরণ বোধ করি, তা অন্য

বইয়ের জন্য নয়।' এতে বোঝা যায় কবিতার প্রতি আপনার বিশেষ অনুরাগ আছে। কবিতা, শিল্প এবং মানব সভ্যতার প্রতি এক ধরনের দায়বদ্ধতা থেকেই আপনি কবিতা লেখেন বলে আমার মনে হয়েছে। আমার প্রশ্ন হলো, আপনার প্রথম দিককার কবিতায় যেমন দেখি নান্দনিকতা, যে-সৌন্দর্যবোধের কথা আপনি বললেন সে-সৌন্দর্যবোধ, জীবনের গূঢ় স্বরূপ অন্বেষণ ইত্যাদি। কিন্তু পরবর্তীকালে আমরা দেখছি আপনার কবিতায় সামাজিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রিক প্রসঙ্গ বেশি করে এসেছে। এসব বাহ্যিক বিষয়ে দরকারি বক্তব্য প্রকাশের জন্য কলাম জাতীয় রচনাই তো অধিকতর কার্যকর। সেক্ষেত্রে কবিতা মাধ্যমটিকে ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা আপনি কেন উপলব্ধি করলেন?

হুমায়ুন আজাদ : আমি যা কিছু লিখেছি তা একই শিল্পকলা বা সৌন্দর্যবোধের বিচিত্র প্রকাশ; তা কখনো কবিতা, কখনো প্রবন্ধ বা অভিসন্দর্ভরূপে দেখা দিয়েছে; তা কখনো দীর্ঘশ্বাসের মতো কোমল কখনো বজ্রের মতো কঠোর; তবে তা আমার একই শিল্পসৌন্দর্যকাতর আন্তর সত্তার প্রকাশ। আমার দুটি সত্তা রয়েছে : একটি ভেতর থেকে ভেতরে ঢোকে, আরেকটি বাইরে থেকে আরো বাইরের দিকে হানা দেয়; আমি নিজের ভেতরে তান্ত্রিক হয়ে থাকতে পারি, আবার ভেঙেচুরে ঢুকতে পারি সমাজে রাষ্ট্রে। আমি চুমোর ভেতরে ঘুমিয়ে পড়তে পারি, আবার লেলিহানও হতে পারি। আমার প্রথম দিকের কবিতায়, আমার সমস্ত গদ্যেও তা রয়েছে। কিন্তু আমি এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকি নি। আমি আবেগ, স্বপ্নভারাতুর সৌন্দর্যের জগৎ থেকে নষ্টভ্রষ্ট রাষ্ট্রে ও সভ্যতায় ঢুকেছি। তৃতীয় বিশ্বের অধিবাসী হওয়ার দায়ভার ও দায়িত্বও পালন করতে হয়েছে আমাকে, যেমন আরো অনেককে; এখানে রাষ্ট্রসমাজ দখল করে থাকে এমন দুর্বৃত্তরা যে বিবেকী মানুষের পক্ষে আত্মমগ্ন শিল্পচর্চা অসম্ভব হয়ে পড়ে। আমার কবিতায় রাজনীতি এসেছে সামাজিক বিবেক থেকে, আমি যে-সমাজরাষ্ট্র চাই তার স্বপ্ন থেকে। আমাদের মতো দুর্দশাগ্রস্ত পীড়িত অঞ্চলে চোখ বুজে শিল্পকলার স্তনের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে শুধু শয়তানের সেবকেরা। কবিতায় সমাজ ও রাজনীতি যেভাবে আসে কলামে সেভাবে আসে না; প্রতি সপ্তাহে সামাজিক রাজনীতিক কবিতা লেখা যায় না, তীক্ষ্ণ কলাম লেখা যায়। আমি অবশ্য কলামের নামে লিখেছি সংহত প্রবন্ধ, তাতে দলীয় রাজনীতি নেই, আছে সভ্যতার রাজনীতি; এবং আমি ওই লেখাগুলোকে শিল্পকলা করতে চেয়েছি। আমার কোনো কোনো কলামপ্রবন্ধ আসলে গদ্যে লেখা কবিতা। কবিতায় সমাজে ঢোকার একটি শৈল্পিক কারণও ছিলো, 'আর্টগ্যালারি থেকে প্রস্থান' নামের একটি কবিতায় আমি তা প্রকাশ করেছি। জ্বলো চিতাবাঘ-এর পরে শিল্পক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, তাই বেরিয়ে পড়তে হয়েছিলো বাহ্যজীবন বা জীবনশিল্পের উদ্দেশে।

মা রা : বর্তমান বাংলাদেশে আপনার যে পরিচিতি দাঁড়িয়েছে, তা বেশ স্পষ্ট করে বলা যায় যে আপনি সাহসী, প্রথাবিরোধী এবং কিছুটা বিতর্কিতও বটে। আপনার কি মনে হয়?

হুমায়ুন আজাদ : আমি প্রথাবিরোধী বাল্যকাল থেকেই। প্রথাগততার সাথে বাল্যকাল থেকেই আমি খাপ খাওয়াতে পারি নি, যদিও অনেক প্রথা আমি মেনে নিতে বাধ্য হই। আমি ছোটোবেলা থেকেই বেড়েছি চারপাশের প্রথার সঙ্গে খাপ না খেয়ে; মনে মনে আমি মেনে নিই নি অনেক কিছুই, বাস্তবেও অমান্য করেছি অনেক কিছু। যতোই বেড়েছি প্রথা না মানার পরিমাণ বেড়েছে আমার মধ্যে, এবং আমার লেখায়

প্রথাবিরোধিতা প্রকাশ পেয়েছে ব্যাপকভাবে, সম্ভবত বাংলাদেশের আর কারো রচনায় এতোটা পায় নি। প্রথা হচ্ছে পুরোনো বিধান, যাকে চালানো হয়েছে কখনো ঐশী বিধান বলে, শাশ্বত বলে যা বর্তমান জীবনে সম্পূর্ণ তাৎপর্যহীন; কিন্তু কোনো বিধানই ঐশী, শাশ্বত, চিরজীবী নয়। প্রথাবাদী মানুষ ও সমাজ সৃষ্টিশীলতাহীন, পুনরাবৃত্তি তার ধর্ম, বাতিল অতীত তার নিয়ন্ত্রক। আমার

সাহসের কথা আমি বারবার শুনি, এটা আমার কাছে হাস্যকর মনে হয়। সাহস কাকে বলে? সাহস হচ্ছে বিপজ্জনক কাজে উদ্যম; কিন্তু আমি তো তেমন কোনো বিপজ্জনক কাজে উদ্যোগী হই না; অর্থাৎ আমি টাওয়ারের বিশতলা থেকে অবলীলায় লাফিয়ে পড়তে পারি না, যখন গুলি চলে আমি তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারি না। আমাকে সাহসী বলা হয়, কেননা আমাদের সমাজের নৈতিকতাবোধ দূষিত হয়ে গেছে। এখানে সত্য প্রকাশকে সাহস বলে মনে করা হয়, সত্যবাদীকে বলা হয় সাহসী। সত্য প্রকাশ এখানে এতোই বিপজ্জনক? আমি চাই অকপটে সত্য প্রকাশ করতে, আর আমার মাতৃভূমি আজ এমনই নষ্ট যে সমাজে সত্য কথা বলাও এখানে সাহসের পরিচায়ক, তা বিশতলা থেকে লাফিয়ে পড়ার মতো বিপজ্জনক। আমাকে সাহসী বলা এটাই জানিয়ে দেয় যে আমাদের সমাজ অত্যন্ত নৈতিক দুর্দশাগ্রস্ত। সত্য বলাকে আমি মনে করি মানুষের সাধারণ গুণ, মানুষের কাছে এটা আমার ন্যূনতম প্রত্যাশা; তাই সত্যবাদীকে আমি সাহসী বলি না। আমার লেখা সাহসের নয়, সৎ উপলব্ধির প্রকাশ। কিন্তু সততাকে এখানে আজ কেনো সাহস বলা হয়? আমাদের সমাজরাষ্ট্র চলে মিথ্যার সূত্রে, মিথ্যাকে নির্ভর করেই এখানে ধনসম্পদ, শক্তি ও খ্যাতি অর্জন করতে হয়; সত্য প্রকাশ করলে ওসব লাভের কোনো সম্ভাবনা থাকে না। তাই সত্যপ্রকাশ আজকের বাংলাদেশে খুবই বিপজ্জনক, এবং ওই বিপজ্জনক কাজটি আমি স্বাভাবিক মনুষ্যত্ববশতই করি, কেননা ধনসম্পদ, শক্তি, খ্যাতির কোনো মোহ আমার নেই। আরেকটি কি ছিলো?

মা রা : বিতর্কিত।

হুমায়ুন আজাদ : আমার সম্পর্কে এ-বিশেষণটি বেশ প্রচলন পেয়েছে, যদিও শব্দটি আজকাল নিরর্থক। আমাদের প্রথাবদ্ধ সমাজে প্রথা একটু ভাঙলেই বিতর্কের জন্ম হয়। তবে সভ্যতার ইতিহাস হচ্ছে বিতর্কের, প্রথা মানা ও না-মানার ইতিহাস; পৃথিবীতে চিরকালই যাঁরা অভিনব কিছু সৃষ্টি করেছেন, যাঁরা সমাজসভ্যতাকে বদলে দিতে চেয়েছেন এবং দিয়েছেন, যাঁরা চিন্তাবিপ্লব ঘটিয়েছেন, তাঁরা সবাই বিতর্কিত। পৃথিবীর প্রধান পুরুষেরা, আমি অবশ্য প্রধান কেউ নই, সবাই বিতর্কিত। এমন কোনো মহাপুরুষ পাওয়া যাবে না, যিনি বিতর্কিত নন। মহাকবিরা, মহাবৈজ্ঞানিকেরা, মহান সমাজবিপ্লবীরা, এমনকি ধর্মপ্রবর্তকেরাও বিতর্কিত; বিতর্কিত মানুষেরাই সভ্যতাকে এগিয়ে দেন, অবিতর্কিতরা থাকে মেষের মতো অবিতর্কিত। আমাদের সমাজ অত্যন্ত বদ্ধ; আমাদের পায়ে পায়ে শেকল; সামাজিক পারিবারিক ধর্মীয় সাহিত্যিক শৈল্পিক ও আরো অসংখ্য শেকল আমাদের বেঁধে রেখেছে, আমরা নিষেধ দ্বারা পরিবৃত। নিষেধের সামান্য সীমা পেরোলেই এখানে বিতর্কিত হতে হয়। সাফল্য অর্জনের জন্য এখানে খাপ খাওয়াতে হয়; তাই এখানে এতো বেশি সুবিধাবাদী, এতো

বেশি খাপ খাওয়ানো মানুষ, তাই এ সমাজ এতো মধ্যযুগীয়। আমি খাপ খাওয়াতে চাই নি। আমি মনে করি গত পাঁচ হাজার বছর ধরে যে-সভ্যতা চলছে, যে-সব প্রথার মধ্যে আমরা আছি, আমাদের দূষিত সমাজ যেমন আছে, তা আর চলতে দেয়া যায় না, তাকে আর তেমন রাখা যায় না। আমি প্রথাগত সমস্ত রীতিনীতি সূত্রেরই বিরোধী, ওই বিরোধিতা প্রকাশ পায় আমার লেখায়, তাই বিতর্কের সৃষ্টি হয়। প্রথাবদ্ধতার সামান্য সীমা অতিক্রম করলে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। যাঁকে ঘিরে বিতর্ক সৃষ্টি হয়, তিনি কিন্তু বিতর্ক সৃষ্টি করেন না, তিনি পেশ করেন নতুন প্রস্তাব; বিতর্ক সৃষ্টি করে প্রথানুসারীরা। সভ্যতার বিকাশের জন্যে বিতর্ক খুবই দরকার, যদিও আমাদের সমাজ পোষমানা মানুষই বেশি পছন্দ করে। আমি বিতর্কিত? বেশ, তাহলে আমি বিতর্কিত, কেননা আমি প্রথার সীমার বাইরে যেতে চাই।

মা রা : আপনার কথার সাথে আমি একমত যে প্রথার বাইরে গেলে বা প্রথার বিরোধিতা করলে, বিতর্কের একটা সূত্রপাত ঘটে। কিন্তু আমি লক্ষ করে দেখেছি যে আপনার রচনা নিয়ে, আপনার সৃষ্টি নিয়ে বরং সেভাবে বিতর্ক আমাদের দেশে হয় নি। হয়েছে আপনার মন্তব্য নিয়ে। খণ্ডিত, অংশত মন্তব্য নিয়ে। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে—এ প্রশ্নটি ঠিক আমারও নয়— অনেকেই এরকম মনে করে থাকেন আপনার ব্যাপারে— সেটা হচ্ছে আপনি কি সচেতনভাবে এমন সব মন্তব্য করতে পছন্দ করেন যাতে একটি তুমুল বিতর্ক সৃষ্টি হয়? নিজেকে আলোচিত চরিত্র হিসেবে দেখবার জন্য একটা গোপন ইচ্ছা কি আপনার ভেতরে কখনো কাজ করে?

হুমায়ুন আজাদ : আমার লেখা বা কথা অসুস্থের প্রলাপ নয় যে তা ঘোরের মধ্যে আঙুল বা গলা থেকে বেরিয়ে আসে; আমার লেখা বা কথা কখনোই অসচেতন কাজ নয়। আমি ভেবেচিন্তে সুবিন্যস্তভাবেই কিছু প্রকাশ করি। আমি যখন কোনো প্রথার বিরুদ্ধে কথা বলি, তখন সচেতনভাবে বলি। ধরা যাক নজরুলের কবিতা সম্পর্কে আমার মন্তব্যটির কথা— যদিও আমার মন্তব্যটি বিকৃতভাবে প্রচার পেয়েছে— আমি সচেতনভাবেই বলেছি। নজরুলের কবিতা সম্পর্কে আমার সৎ বোধেরই প্রকাশ ওই মন্তব্য, এবং আমার মন্তব্য একশো ভাগ সত্য; কিন্তু আমার বিরোধীরা সত্য থেকে লক্ষ মাইল দূরে বলে আমার মন্তব্য নিয়ে মাতামাতি করেছে। তারা যুক্তি ও বিচারে নেই, আছে মত্ততায়। আমি কোনো রকম সাড়া জাগানোর জন্য মন্তব্য করি না। আমার প্রতিটি বইয়ের প্রায় প্রতিটি পাতায় কোনো না কোনো বিতর্কিত মন্তব্য বা ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। আমার দিক থেকে ওগুলো সত্য, আসলেই সত্য, তবে প্রথাবাদীদের মতে বিতর্কিত; কেননা সেগুলো প্রথাসিদ্ধ বহু সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করে। যে-সমস্ত সিদ্ধান্ত আমাদের সমাজসংস্কৃতিতে ধ্রুব বলে গৃহীত, তার অধিকাংশের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ

করি, স্পষ্ট ভাষায় আমার দ্বিমত প্রকাশ করি। অনেকে আছেন যাঁরা আমার মতোই বোধ করেন, কিন্তু সামাজিক রাজনীতিক ব্যক্তিগত অসুবিধার কথা ভেবে চুপ থাকেন। আমি অসুবিধার কথা ভাবি না। আমি কোনো ব্যক্তি, বই, মত সম্পর্কে যা বোধ করি, তা সরাসরি অকপটে প্রকাশ করি। তবে আলোচিত হওয়ার বা সাড়া জাগানোর জন্যে করি না। কোপার্নিকাস বা গ্যালিলিও যখন সৌরপরিক্রমার নতুন সূত্র দেন, তখন তাঁরা সাড়া জাগাতে চান নি, চেয়েছেন সত্য প্রকাশ করতে। জীবনের বিনিময়ে তাঁরা প্রকাশ করেছেন সত্য। বিদ্যাসাগর, রামমোহন যখন সংস্কারের প্রস্তাব দিয়েছেন, তখনই বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে; জীবন বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। যখনই কেউ প্রথাবদ্ধ মিথ্যাকে বর্জন করতে চেয়েছেন তখনই এদেশে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। সত্যান্বেষীরা কখনোই আলোচিত হবার জন্য বিতর্ক সৃষ্টি করেন না; তাঁরা নতুন সূত্র রচনা করতে চান। নতুন সত্য সাধারণত অভিনন্দিত হয় না, কেননা অধিকাংশ মানুষ প্রথার মধ্যেই স্বস্তি বোধ করে, প্রথা তাদের জন্যে সুবিধাজনক। আমাদের এখানে চিন্তাকে যুক্তিসঙ্গত চিন্তা দিয়ে প্রতিক্রমণ করা হয় না, করা হয় ব্যক্তিগত আক্রমণ; এখন সাধারণত দেয়া হয় ছুরিকার হুমকি। আমি কোনো প্রচারের মোহে বিতর্ক সৃষ্টি করি না, সত্য প্রকাশ করতে চাই বলেই প্রথাবাদীরা বিতর্ক বাধায়।

মা রা : আপনার কোনো বিশেষ রাজনৈতিক বিশ্বাস আছে?

হুমায়ুন আজাদ : আমার অবশ্যি রাজনীতিক বিশ্বাস রয়েছে, তবে আমি বাংলাদেশের কোনো রাজনীতিক দলের অনুসারী নই। আমি যে-ধরনের সামাজিক রাজনীতিক ব্যবস্থা চাই, তা বাংলাদেশের কোনো দলের স্বপ্নেও নেই।

মা রা : আপনার সে-ই কাঙ্ক্ষিত ব্যবস্থা— যেটা আপনি বললেন আর কি— সে-ব্যাপারে কি আরো স্পষ্ট করে বলবেন?

হুমায়ুন আজাদ ; আমার সামাজিক রাজনীতিক রচনাগুলোতে ওই ব্যবস্থার কিছুটা আভাস রয়েছে। আমার কাম্য সমাজ আর্থিকভাবে শোষণমুক্ত, রাজনীতিকভাবে গণতান্ত্রিক, তবে তা নষ্ট রাজনীতিকদের প্রতারক গণতন্ত্র নয়; তার সাংস্কৃতিক মান উন্নত, সেখানে সৃষ্টিশীলতা প্রধান ব্যাপার। সেখানে মানুষ কোনো ভাবাদর্শের তলে বাস করতে বাধ্য হবে না; ভাবাদর্শের কারাগার মানুষকে বিকশিত হ'তে দেয় না।

মা রা : আপনার লেখা প্রসঙ্গে ফিরে আসি। আপনি অনেক ধরনের লেখা লেখেন, শুধু কবিতাও লেখেন না, শুধু প্রবন্ধও লেখেন না, সমালোচনা, গবেষণা করেন, অনেক কিছু করেন। কবিতা এবং প্রবন্ধ এ দু'ভাগে যদি ভাগ করি— প্রবন্ধের ভেতরে গবেষণামূলক, সৃজনশীল বা সমাজ সচেতনমূলক— আপনি গল্পও কিছু লিখেছেন, এখন পর্যন্ত অবশ্য সেভাবে পুস্তক করেন নি, তো কবিতা এবং প্রবন্ধ এ দু'টি ভিন্ন ধরনের রচনাকর্মের প্রক্রিয়াটি কী রকম? আমি বলতে

চাচ্ছি লিখবার প্রস্তুতি, লিখনপদ্ধতি, চিন্তা-ধারার প্রকৃতি, শৃঙ্খলা ইত্যাদি বিষয় এই দুই ধরনের রচনার ক্ষেত্রে কিভাবে অনুসৃত হয়, যখন আপনি লিখবার জন্য মনস্থির করেন।

হুমায়ুন আজাদ : মানুষের মগজের দুটি ভাগ রয়েছে; একভাগ করে সৃষ্টিশীল কাজগুলো, আরেক ভাগ করে মননশীল ভাষ্যাত্মক কাজগুলো। সাধারণত কোনো মানুষের একটি ভাগই সক্রিয় থাকে, অর্থাৎ কেউ হয় সৃষ্টিশীল, কেউ মননশীল; তবে কিছু মানুষ রয়েছে যাদের মগজে দুটি এলাকাই সক্রিয়। সম্ভবত আমার মস্তিষ্কের দুটি এলাকাই সক্রিয়; তাই আমি সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে চাই, আবার লিখতে চাই ভাষা-সাহিত্য-সমাজের সূত্র। আমি অবশ্য মনে করি আমার সমস্ত লিখিত কাজই শিল্প সৃষ্টি; যখন কবিতা বা সমালোচনা বা সামাজিক-রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখি, বা কিশোরদের জন্য লিখি, এমনকি ভাষাবিজ্ঞান লিখি তখন আমি শিল্পই সৃষ্টি করি। কেননা কোনো লেখার সময়ই আমি রূপকারী বিবেককে অবহেলা করি না। আমার মননশীলতা ও সৃষ্টিশীলতার দুটি দিকই হয়তো সমান সক্রিয়; তবে মননশীলতার চাপটি আমার ওপর খুব বেশি পড়ে। আমাদের এখানে গদ্য লেখকের সংখ্যা যেহেতু খুব কম; তাই আমাকে অনেক সময় বাধ্য করা হয় গদ্য লেখার জন্যে। আমার ভেতরে অবশ্য সৃষ্টিশীলতা ও মননশীলতার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। আমি প্রবল আবেগ, কাতরতা, স্বপ্ন, এবং দিবাস্বপ্নের মধ্যে দিনের পর দিন থাকতে পারি; আবার যখন সমালোচনা লিখি বা ভাষাবিজ্ঞান চর্চা করি, তখন আমি শুষ্ক বিজ্ঞানী হতে পারি, লিখতে পারি বিশ্লেষণের পর বিশ্লেষণ ও ভাষ্য, হতে পারি র‍্যাঁবোকথিত 'জীবাশ্মের মতো মৃত'। আমি গোলাপের মতো লাল হতে আর কঙ্কালের মতো নির্মোহ হতে পারি, আমার ভেতরে কঙ্কাল ও গোলাপের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কিন্তু বাহ্যিক বিরোধ রয়েছে। বাইরে থেকে আমার ওপর চাপ বেশি পড়ে গদ্যের জন্যে; চারপাশ এখন নানা ধরনের সম্পাদকে ভরে গেছে; তাঁরা গোলাপের বদলে কঙ্কালই বেশি চান আমার কাছে। তাই কবিতা কমেছে; আমি অনেক আবেগ ও চিত্রকল্পের কবরের ওপর রচন করেছি কঙ্কাল।

মা রা : সম্পাদকদের তাগাদার কথা, চাপের কথা আপনি বললেন, এটা তো বাহ্যিক ব্যাপার এবং সেক্ষেত্রে আপনাকে মননশীলতার চর্চা বেশি করে করতে হয়। আপনাকে দেখে, আপনার সঙ্গে মিশে, আপনার লেখা পড়ে, আপনার যে মানসিক পরিচয় আমি পাই, তাতে আমার কাছে মনে হয় আপনার অন্তর্তাগিদ কিন্তু কবিতার। আপনি বেশি বেশি কবিতা লিখতে চান, বাইরে থেকে একটা চাপ দেবে, আর আপনি সেই চাপ অনুযায়ী কাজ করবেন এমন লোক বোধ হয় আপনি নন। আপনি ভিতরের চাপে কিছু সৃষ্টি করতে পারেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনি দীর্ঘকাল যাবৎ কোনো কবিতাই লিখছেন না। কবিতা লিখছেন কিনা জানি না, তবে ছাপা দেখছি না। তাই মনে হচ্ছে আপনি লিখছেন না কবিতা।

হুমায়ুন আজাদ : বাইরের চাপে আমিও সাড়া দিই, প্রিয়দের চাপ সব সময় এড়ানো যায় না। চাপে আমার অনেক কবিতা মরেছে। কবিতা না লেখার দুটি কারণ মনে পড়ছে; কয়েক দশক ধরে আমি সমাজরাষ্ট্র ও নারীবিষয়ক চিন্তায় জড়িয়ে রয়েছি; এবং চারপাশের কবিতা যখন পড়ি, আর নিজে যখন লিখতে চাই তখন বোধ করি যে গত দু-দশকে বাংলা ভাষা এবং বাঙালির আবেগ-বোধ-কল্পনাকে আমরা বড়োবেশি দূষিত করে ফেলেছি। চারপাশে এখন চলছে দূষিত পংক্তির প্রাবল্য, কলুষিত কল্পনার মরুভূমি ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে; আমার পংক্তিতেও লেগেছে ওই দূষণের ছাপ। দূষিত স্বপ্নকল্পনা প্রকাশের থেকে অপ্রকাশই ভালো। দরকার বাংলা ভাষা ও বাঙালির স্বপ্নকে পরিশুদ্ধ করে তোলা, কলুষমুক্ত করা। মাঝেমাঝে মনে হয় বাংলা ভাষাকে আমরা এতো নষ্ট করেছি যে এ-ভাষা আর কবিতার উপযুক্ত নয়। আর কবিকে লিখতেই হবে অজস্র কবিতা? আমাদের এমন ধারণা রয়েছে যে কবিকে লিখতে হবে হাজার হাজার কবিতা, এটা ঠিক নয়। মালার্মের কবিতার সংখ্যা সম্ভবত একষট্টি, সুধীন্দ্রনাথ কবিতা লিখেছেন দু'শোর কম; জীবনানন্দ সম্ভবত আড়াই শো, এলিয়ট সম্ভবত এক শো, আর ঈশ্বর গুপ্ত নাকি কবিতা লিখেছেন বিশ হাজার! দিনরাত কবিতার মতো কিছু লেখা কবির কাজ নয়, তাঁর কাজ কবিতা লেখা; কম হতে পারে, কিন্তু কবিতা।

মা রা : কলুষমুক্ত স্বপ্ন, কলুষমুক্ত ভাষা এগুলো এ তো পুনরুদ্ধার করতে

হবে কবিকেই। সে-ব্যাপারে আপনি কি ভাবছেন?

হুমায়ুন আজাদ : কবির এক বড়ো কাজ গোত্রের ভাষাকে পরিস্রুত করা, এর জন্যে দরকার খুব বড়ো কবি, ও কালের আনুকূল্য। দুই-ই দুরাশা এখন। তবে আমার মনে হয় বাহ্যবাস্তব ও
বাহ্যিক ভাষা পরিহার করে আমাদের ঢুকতে হবে আন্তর জগতে, কথা বলতে হবে আন্তর একান্ত ভাষায়।

মা রা : লেখার শুরুতে দেখা যায় প্রত্যেকেই কারো না কারো দ্বারা প্রভাবিত হন। গদ্য এবং

কবিতা-মননশীলতা এবং সৃষ্টিশীলতা— এই দুই ধরনের রচনার ক্ষেত্রে আপনার জন্যে এই নেপথ্য প্রেরণাদাতা কিংবা আদর্শ কারা কারা? এ প্রশ্নের সঙ্গে আমি একটু যোগ করতে চাই, এখনো কি তারা সমান গুরুত্ব বহন করে আপনার কাছে?

হুমায়ুন আজাদ : কবিতায় আমি ঠিক একক কোনো কবি দিয়ে প্রভাবিত হয়েছি বলে মনে হয় না, যদিও সুধীন্দ্রনাথ বা জীবনানন্দ, এবং পশ্চিমের কোনো কোনো কবি আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন। গদ্যে আমি সচেতনভাবেই, তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত, মেনেছি বুদ্ধদেব বসু এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রভাব। তার পর আমার গদ্যে সুধীন্দ্রনাথ নেই, বুদ্ধদেবও নেই। কবিতায় তাঁদের প্রভাব ধারণ না করলেও এক বিশেষ বয়স থেকে আমার কাছে বাংলা কবিতায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিরিশি আধুনিকেরা, এক সময় তাঁদের আমি 'পাঁচ যুবরাজ' আখ্যাও দিয়েছিলাম; সম্মিলিতভাবে তাঁদের সম্রাটও বলতে পারি। তাঁদের সম্মিলিত সৃষ্টির গুরুত্ব আমি কবর পর্যন্ত স্বীকার করে যাবো। বাল্যকালে পাঠ্যপুস্তকের মধ্য দিয়ে যাঁদের কবি হিসেবে জেনেছিলাম, পরে বুঝেছি দুজন, মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কেউ বড়ো কবি নন; অনেকেই কবিও নন। আমরা বহু কাব্যিক কিংবদন্তির মধ্যে বাস করি, সে-সব মেনে চলতে হয়; তবে অনেক দিন ধরেই আমার মনে হয় বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ নন, শ্রেষ্ঠ কবি সম্মিলিতভাবে তিরিশের ওই পাঁচজন।

মা রা : আপনি একটি লেখায় বলেছেন যে এই পাঁচজনের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কবি শামসুর রাহমান। অবশ্যি এটি বলেছেন বেশ আগে— পনের বিশ বছর আগে।

হুমায়ুন আজাদ : হ্যাঁ।

মা রা : নিঃসঙ্গ শেরপা/শামসুর রাহমান-এ বলেছেন।

হুমায়ুন আজাদ : হ্যাঁ।

মা রা : আপনার কি এখনো সেটা মনে হয় বা মনে করেন?

হুমায়ুন আজাদ : আমি এখনো তা-ই মনে করি। কেনো তিনি ওই পাঁচজনের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তা আমি ব্যাখ্যা করেছি; আমার ব্যাখ্যা বস্তুনিষ্ঠ ও শৈল্পিক, তা থেকে সরে আসার মতো বিশাল কাব্যিক ঘটনা এর মাঝে ঘটে নি।

মা রা : সমর সেনকে আপনার কি মনে হয়?

হুমায়ুন আজাদ : চমৎকার, এবং চমৎকার, কিন্তু সীমাবদ্ধ। তিনি বাংলা ভাষায় ইলিয়টের বাকভঙ্গি একমাত্র তিনিই আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি কিছু অভাবিত অসামান্য চিত্রকল্পের কবি।

মা রা : আমাদের দেশে শামসুর রাহমানের কবিতা বা কবিখ্যাতির পাশে এখন সচেতনভাবে বা একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থেকে কাউকে কাউকে দাঁড় করানোর চেষ্টা হয়েছে। আপনার কি এ রকম মনে হয়নি?

হুমায়ুন আজাদ : এমন দূষিত সমাজে আমরা বাস করি যে শিল্পকলাও এখানে নোংরা রাজনীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে; আমরা নিরপেক্ষ কাব্য মূল্যায়ন করার মতোও সৎ নই। বিপথগামী বাংলায় প্রতিক্রিয়াশীল মধ্যযুগীরা এখন খুবই সক্রিয়; তাঁরা একসময় একজন ফররুখ আহমদ তৈরি করেছিলো, এখন একজন আল মাহমুদ তৈরি করছে; কেননা প্রতিক্রিয়াশীলদেরও একজন কবি দরকার, যদিও মৌলবাদে কবি নিষিদ্ধ। ফররুখ এক উচ্চকণ্ঠ মৌলবাদী পদ্যরচয়িতা, রাজাকারদের জাতীয় কবি; আর এখন আল মাহমুদ প্রতিক্রিয়াশীলদের কবি। ফররুখ ও আল মাহমুদের পরিণতি একই, তাঁরা দুজনেই ক্রমশ মধ্যযুগী মৌলবাদী হয়েছেন। তবে ফররুখ সুবিধার জন্যে মৌলবাদী হন নি, আল মাহমুদ কতকগুলো কুৎসিত সুবিধার জন্যে হয়েছেন মৌলবাদী; তাঁর কোনো বিশ্বাসই সত্য নয়। এক সময় তিনি পাড়ার মসজিদ ভেঙে পড়ার শব্দে উল্লাস বোধ করেছেন, আরেক সময় উল্লসিত হয়েছেন একথা ভেবে যে চাষিরা সচিবালয় দখল করবে; এখন তিনি জায়নামাজে বসে নারীধর্ষণের স্বপ্নে বিভোর। তাঁর গত দু-দশকের কবিতা অপবিশ্বাসের কপট কবিতা, এবং কবিতাই নয়। আল মাহমুদ প্রথাগত, জসীম-ফররুখ-জীবনানন্দের মিশ্রণ, তাই প্রথাগতদের কাছে ওই সব কবিতাকে কখনো কখনো বেশি ভালো লাগতে পারে, কিন্তু তার মূল্য খুবই কম; কেননা তা চেতনার বিকাশ না ঘটিয়ে চেতনার পুনরাবৃত্তি ঘটায়। শামসুর রাহমানের ব্যর্থ কবিতাটিও মূল্যবান, কেননা তা অগ্রসর চেতনা প্রকাশ করতে চায়। আল মাহমুদের কবিতা যেখানে কবিতা হয়েছে সেখানেও তিনি মধুর মাইনর কবি।

মা রা : সমকালীন বাংলা সাহিত্য (কথাসাহিত্য, কাব্যসাহিত্য, প্রবন্ধসাহিত্য) সম্পর্কে আপনার সংক্ষিপ্ত মতামত ব্যক্ত করার অনুরোধ করছি।

হুমায়ুন আজাদ : সমকালীন বলতে কোন্ থেকে কোন্ সময় পর্যন্ত বুঝবো?

মা রা : আমাদের স্বাধীনতাউত্তর কালই না হয় ধরি।

হুমায়ুন আজাদ : শুধু বাংলাদেশের সাহিত্য?

মা রা : হ্যাঁ, বাংলাদেশের। একাত্তরের পর থেকেই ধরা যাক। দু'টো দশক তো পাচ্ছি আমরা।

হুমায়ুন আজাদ : সত্তর-আশি দুটো দশক। আমরা বিশ্বমাপের সাহিত্য সৃষ্টি করি নি। এ-দু-দশক ধ'রে। কবিতায় অভিনব, শিহরণজাগানো প্রতিভা এ সময়ে জন্ম নেয় নি; উপন্যাসে তাই। এ-সময়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটেছে সৈয়দ শামসুল হকের। ছোটগল্পে যে-দু-তিনজন রয়েছেন, তাঁরাও ক্রমশ সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর হয়েছেন। আমাদের সমালোচনা, প্রবন্ধ, গবেষণা পশ্চিমের দ্বিতীয় মাপের থেকেও নিম্ন। আমাদের সাহিত্য খুব অসাধারণ বলে আমরা গৌরব করতে পারি না; গৌরব করতে হলে বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় যেতে হবে, দেখতে হবে স্পেনীয়, ফরাসি, জার্মান, ইংরেজি, ও নানা আফ্রিকি ভাষায় যা লেখা হচ্ছে তার পাশে আমাদের লেখা দাঁড়াতে পারে কিনা? আমাদের উপন্যাস নষ্টই হয়ে গেছে, তা আর প্রাপ্তবয়স্ক মনস্ক পাঠকের উপযুক্ত নয়, কবিতা জুড়ে চলছে ব্যাপক দূষণ, প্রবন্ধ ও গবেষণা শোচনীয়ভাবে তত্ত্ব ও আইডিয়াশূন্য বিবরণবর্ণনা। বিশ্বসাহিত্য আমার নখদর্পণে নয়, তবে বাংলাদেশের সাহিত্যের সব শাখার নিম্নতা চোখ এড়াতে পারে না, বোঝাও কঠিন নয় যে আমাদের সাহিত্য বিশ্বমাপের নয়। বাংলাদেশের সব কিছুর মতো সীমাবদ্ধ আমাদের সাহিত্যও।

মা রা : নানা কারণে সাম্প্রতিককালে বাংলা সাহিত্যে কোনো কোনো লেখক আলোচিত হয়ে উঠেছেন নানা ভাবে। এর সব কিছুই যে সাহিত্যিক বা সৃজনশীল প্রক্রিয়ার কারণে, তা হয়তো নয়। অন্যান্য কারণও আছে। প্রচার মাধ্যমের কারণ বা জনপ্রিয়তা কিভাবে সৃষ্টি হয়ে যায় অনেক ব্যাপার থাকে। আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে আলোচিত কবি, কথাশিল্পী যাঁরা আছেন বা বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন, জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন, এঁরা মুষ্টিমেয়। এঁদের সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন আপনার কাছে চাইছি। আমি নাম বলতে পারি যদি আপনি...

হুমায়ুন আজাদ : নাম বলাই তো ভালো।

মা রা : আমি কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছি। এর বাইরেও কেউ কেউ থাকতে পারেন। শামসুর রাহমানের কথা বলেছি। কবিতায় নির্মলেন্দু গুণ, রফিক আজাদ, সিকদার আমিনুল হক, যাঁর একটি বই নিয়ে বেশ আলোচনা হয়েছে। কথাসাহিত্যে হাসান আজিজুল হক, সৈয়দ শামসুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, এসবের বাইরে একটি নাম 'আনন্দ পুরস্কার' প্রাপ্তির কারণে নতুনভাবে আলোচনায় এসেছে, তসলিমা নাসরিন। এর বাইরেও যদি কেউ থাকে আপনি সেটা যোগ করতে পারেন। এঁদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করুন।

হুমায়ুন আজাদ : শামসুর রাহমান কলামপ্রাবন্ধিক হয়ে উঠেছেন, যদিও তাঁর চিন্তা ও গদ্য দুর্বল। নির্মলেন্দু এখন অনেকটা প্রাক্তন কবি, তাঁর ষাট-সত্তর

দশকের ব্যর্থ জীবনযাপনের ভাবাবেগী স্বভাবকবিত্বময় কবিতাগুলোর জন্যেই তিনি কবি-প্রথাগত ধারার; দলীয় রাজনীতি তাঁকে নষ্ট করেছে। রফিক আজাদকে আমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করি; তাঁর কবিতার ভারীত্ব, যার সাথে মিল আছে তার শরীরকাঠামোর, আমার খুব পছন্দ; তবে তিনিও এখন স্তব্ধ। সিকদার আমিনুল হকের যতোটা শিল্পস্পৃহা রয়েছে, তাঁর লেখায় ততোটা কবিতা নেই; সম্পূর্ণ কবিতা তিনি খুবই কম লিখতে পেরেছেন। গদ্য ও কবিতা দুটো মিলে সৈয়দ শামসুল হক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তবে যতোটা গুরুত্বপূর্ণ তিনি ততোটা গুরুত্ব তিনি পান না।

মা রা : কেন পান না বলে আপনার মনে হয়?

হুমায়ুন আজাদ : এর এক কারণ আমাদের পাঠকেরা, বিশেষ করে সাহিত্যবিচারকের বহুমাত্রিক লেখক নিয়ে অস্বস্তিতে ভোগেন, তাঁরা ঠিক পারেন না লেখকের কোন পরিচয়টি তাঁরা প্রধান করে তুলবেন। সব কিছু মিলিয়ে দেখার স্বভাব আমাদের নেই। শামসুর রাহমান যদি বহুমাত্রিক হতেন, তবে তাঁর কবিভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হতো। সব কিছু মিলিয়ে দেখতে না পারার ফলে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বুদ্ধদেব বসু, তেমনই ক্ষতিগ্রস্ত সৈয়দ হক এবং আরো কেউ কেউ।

মা রা : সৈয়দ শামসুল হক গুরুত্বপূর্ণ— আপনার সাথে আমি একমত। তিনি গুরুত্ব পান না তার পেছনে আপনি যে মূল্যায়নের কথা বললেন, বহুমাত্রিক লেখকদের মূল্যায়নের সংকট, সেটা তো আছেই। আমার কাছে মনে হয়েছে তিনি গুরুত্বপূর্ণ লেখক হওয়া সত্ত্বেও গুরুত্ব পান না এর নেপথ্যে তিনিই সবচেয়ে বড়ো কারণ।

হুমায়ুন আজাদ : তাঁর সামাজিক-রাজনীতিক সন্দেহজনক আচরণ তাঁর গুরুত্ব কমিয়েছে অনেকখানি।

মা রা : হ্যাঁ, সেটিই আমি বলতে চাচ্ছি।

হুমায়ুন আজাদ : হতে পারে। লেখক ও প্রকাশ্য সৈয়দ হক, ও নেপথ্যচারী সৈয়দ হকের ভাবমূর্তির মধ্যে একটি বিরোধ রয়েছে বলে লোকবিশ্বাস গড়ে উঠেছে, তাঁর ব্যক্তিত্বের সততা সম্পর্কে রয়েছে চারপাশে গভীর সন্দেহ; তাই তিনি বড়ো ব্যক্তিত্বরূপে গৃহীত হতে পারেন নি, তার সম্ভাবনাও কম। হাসান আজিজুল হক সবচেয়ে ভাগ্যবান এবং প্রশংসিত লেখকদের একজন। তিনি এতো কম লিখে এতো সংবর্ধনা লাভ করেছেন, যা কোনো গদ্য লেখকের ভাগ্যে জোটে নি, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌রও নয়। তিনিও চমৎকারভাবে শুকিয়েছেন।
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস একান্তভাবেই ছোটগল্পকার; তিনি ঢাকা শহরের এক সীমাবদ্ধ এলাকার সীমাবদ্ধ জীবনের সীমাবদ্ধ ভাষার সীমাবদ্ধ গল্পকার; প্রবণতায় প্রাকৃতবাদী। তাঁর অতিপ্রশংসিত উপন্যাসটি এক ব্যর্থ উদ্যোগ, একে বলতে পারি উল্লেখযোগ্য ব্যর্থতা। তিনি পাঠকের কাছে পৌঁছোতে পারেন নি, তবে

সাহিত্যবোধহীন তৃতীয়মানের আলোচকদের সন্ত্রস্ত করে হীনমন্যতায় ভোগাতে পেরেছেন; তাঁরা এর ভাষা ও আকৃতি দেখেই ভীতসন্ত্রস্ত অতিশয়োক্তিতে মেতেছেন। এটি ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের অন্তর ও বাস্তবতাকে না বুঝে গণঅভ্যুত্থান উপস্থাপন, এটি এক বিকারকাহিনী। তিনি ঢাকা ও গ্রামকে মেলাতে পারেন নি, এবং চর্চা করেছেন ভুল সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদ। উচ্চাভিলাষী ব্যর্থতাগুলোর একটি তাঁর বইটি। হুমায়ূন আহমেদ, ইমদাদুল হক মিলনের পুস্তিকাগুলোর একটি প্রজাতিনাম আমি দিয়েছি 'অপন্যাস'। হুমায়ূন আহমেদ শুধুই জনপ্রিয়, তাঁর লেখার সাহিত্যমূল্য নেই; ওগুলো বাজারের চাহিদা অনুসারে উৎপাদিত। মিলন প্রচুর বাজে লিখেছেন, কিন্তু কয়েকটি চমৎকার বই লিখেছেন : পরাধীনতা বা বনমানুষ বা কালাকাল উৎকৃষ্ট লেখা।

মা রা : হুমায়ূন আহমেদকে আপনি গুরুত্বহীন বলছেন কেন?

হুমায়ুন আজাদ : তাঁর লেখা আর্থিক উদ্দেশ্য থেকে ছক মেপে বানানো; তা অভিজ্ঞতাহীন উপলব্ধিহীন কিশোর ও নির্বোধতোষ উপাখ্যান; জীবনকে তিনি টেলিভিশনের বিশ ইঞ্চি মাপে কেটে নিয়েছেন।

মা রা : তাঁর নন্দিত নরকে, শঙ্খনীল কারাগার?

হুমায়ুন আজাদ : ওগুলোও তাই। উপাখ্যান। নন্দিত নরকে পত্রিকায় প্রকাশের পর সম্পাদক আমার মত জানার জন্যে খুব ব্যগ্রতা দেখিয়েছিলেন, আমি পড়ে মূল্যবান মনে করি নি। বই দুটির নাম সুন্দর, তবে নামগুলো অন্যের।

মা রা : কিন্তু আপনার শিক্ষক তো করেছেন।

হুমায়ুন আজাদ : তিনি আমার শ্রদ্ধেয় অন্য কারণে, সাহিত্য মূল্যায়নের জন্যে নয়। তসলিমা এখনো লেখক হন নি। পুরস্কার? তাতে কিছু যায় আসে না।

মা রা : কবিতা প্রসঙ্গে দু'একটি কথা বলে আমরা অন্য প্রসঙ্গে যাবো। আপনার কবিতায় কিছু নারীর কথা আছে। তরুণী সন্তের কথা আছে। এরা কি বাস্তবের নারী?

হুমায়ুন আজাদ : নারী মাত্রই তো বাস্তবের, কোনো অবাস্তব নারী নেই। তবে আমার কোনো প্রেমের কবিতাই সম্পূর্ণরূপে কোনো বিশেষ নারীকে নিয়ে নয়, বাস্তব নারী ও কল্পনার সৃষ্টি ওই নারীরা। প্রেমিকামাত্রই সন্ত।

মা রা : কবিতা রচনার পেছনে নারী বেশ প্রেরণাময়ী হয়ে এসেছে, এমন কি হয়েছে আপনার?

হুমায়ুন আজাদ : প্রেরণা আমার বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত নয়; আর আমি কামবুভুক্ষু তরুণ বা মানসিক অকালস্খলনগ্রস্ত বুড়ো নই যে নারী দেখলেই প্রেমে পড়ে যাবো, ঠোঁট এগিয়ে দিয়েছে বলেই তাকে প্রেরণাময়ী ভাববো। আমার মধ্যে ঝিলিক ঢোকে বিভিন্ন দিক থেকে।

মা রা : আচ্ছা যদি একজন কবি, প্রিয় কবির কথা বলতে বলা হয় আপনাকে, বাঙলাসাহিত্যে একজন এবং বিশ্বসাহিত্যের একজন— একই সাথে আমি

কথাসাহিত্যের কথাও বলছি— দেশে এবং দেশের বাইরে— কারা কারা আপনার প্রিয়?

হুমায়ুন আজাদ : শুধু একজন প্রিয়র নাম বলতে আমার ভালো লাগে না। আমার প্রিয়র সংখ্যা অনেক, শুধু একজনের নাম বলতে আমার অপরাধ বোধ হয়।

মা রা : ভাষাবিজ্ঞানী হিসেবে আপনার কাছে আমার প্রশ্ন, বাংলাদেশে ভাষাবিজ্ঞান চর্চা কতটুকু হয়েছে? আপনার নিজের কোনো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আছে কিনা এ প্রসঙ্গেও কিছু বলুন।

হুমায়ুন আজাদ : বাংলাদেশে ভাষাবিজ্ঞান চর্চাকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি। প্রথম পর্যায়ে রয়েছে তুলনামূলক— ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান, যা প্রধানত চর্চা করেছেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। তিনি অবশ্য ভালো করে চর্চা করেন নি, তাঁর ওপর যে-দায়িত্ব ছিলো তা তিনি পালন করেন নি। ভাষাবিজ্ঞানী হিসেবে তিনি ব্যর্থ, যদিও তাঁকে ঘিরে এক শূন্য কিংবদন্তি তৈরি করা হয়েছে। বাংলাদেশে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ভাষাবিজ্ঞানী, যাঁকে বাংলাদেশে 'ভাষাবিজ্ঞানের জনক' বলতে পারি, তিনি অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই। তিনিই প্রথম বাংলাদেশে বিজ্ঞানসম্মত ধ্বনিবিজ্ঞান চর্চার সূচনা করেন, নিপুণভাবে বিলেতি রীতিতে বর্ণনা করেন বাংলা ধ্বনি। তাঁর অনুপ্রেরণায় ষাটের দশকে কয়েকজন ধ্বনিবিজ্ঞানে অন্তত শিক্ষিত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা ভাষাবিজ্ঞানী হয়ে উঠতে পারেন নি; তাঁদের মনোযোগ ছিলো অন্যদিকে। স্বাধীনতার পর ভাষাবিজ্ঞান চর্চার নতুন ধারা শুরু হয়। আমরা কয়েকজন বিদেশে যাই; ভাষাবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক রূপ অর্থাৎ চোমস্কীয় রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ, ও অন্য কোনো কোনো শাখা শিখে ফিরে আসি। বাংলাদেশে ভাষাবিজ্ঞানে যাঁদের ডিগ্রি রয়েছে, তাঁদের ভাষাবিজ্ঞানী বলা অতিশয়োক্তি। আমাদের অধিকাংশই ভাষাবিজ্ঞানের মৌল ব্যাপারগুলোও ঠিকমত বুঝি না; অনেকের লেখা বইপত্র ভুলের আকরগ্রন্থ। অনেকে নির্ভুল বাঙলাও লিখতে জানি না; নিষ্ঠা তো নেই কারোই। বাংলাদেশে ভাষা নিয়ে যে-সব কাজ হয়, তাকে ভাষাবিজ্ঞান চর্চা বলা যায় না।

মা রা : আমার প্রশ্নের আরেকটি অংশ ছিলো আপনার নিজের পরিকল্পনা সম্পর্কে।

হুমায়ুন আজাদ : আমার নিজের ভাষাবিজ্ঞানী হওয়ার অভিলাষ ছিলো না, যদিও ভাষায় আমার উৎসাহ আবাল্য। আমি কবি এবং সমালোচক হতেই চেয়েছিলাম। স্বাধীনতার পর আমি একটি বৃত্তি পাই ভাষাবিজ্ঞান পড়ার জন্যে। তখন আমি আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের অ, আ-ও জানতাম না; কিন্তু প্রাণপণে ভাষাবিজ্ঞান শিখে *Pronominalization in Bengali* সন্দর্ভটি লিখি। দেশে ফিরে আমি কিছুটা দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করি; বাক্যতত্ত্ব ও আরো কয়েকটি বই লিখি,

সম্পাদনা করি বাংলা ভাষা নামের দু-খণ্ডের গ্রন্থটি। এ-বইতেই বাঙলা ভাষাতত্ত্ব চর্চার দু-শো বছরের অধিক সময়ের দীর্ঘ ধারাটি উদঘাটিত হয়। আমি আরো কিছু কাজ করেছি, যা দুই বাংলার পটভূমিতে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু বিশ্বপটভূমিতে নয়। আমার একটি স্বপ্ন ছিলো পাঁচ-ছ খণ্ডে রূপান্তরমূলক কারক ব্যাকরণ পদ্ধতিতে বাংলা ভাষার একটি বিস্তৃত পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাকরণ লেখার, কিন্তু তা বোধ হয় পূর্ণ হবে না। আমি এর একটি রূপরেখাও প্রকাশ করেছি, কীভাবে তা লেখা হতে পারে, তাও জানিয়েছি, কিন্তু সাড়া মেলে নি। আমি পাঁচ-ছ হাজার পৃষ্ঠার একটি ব্যাকরণের কথা ভাবছি, ওই ব্যাকরণ ছাত্রপাঠ্য নয়, ভাষাবিজ্ঞানীর ব্যাকরণ, যা থেকে একদিন তৈরি করা যাবে বিদ্যালয়ী ব্যাকরণ। এমন একটি ব্যাকরণ একজনের শ্রমে রচিত হতে পারে না; এর জন্যে দরকার কয়েকজন গবেষক, বছর দশেক সময়, এবং তিন চার কোটি টাকা। বাংলা নিয়ে কপট ভাবাবেগের শেষ নেই, টাকা অজস্র বাজে কাজে অপচয় করি আমরা, কিন্তু কোনো একাডেমী বা সরকার এতে উৎসাহ দেখায় নি। আমি যদি দালালিতে অভ্যস্ত হতাম, তাহলে এ-টাকাটা সংগ্রহ করতে কষ্ট হতো না। আমাদের কোনো বড়ো স্বপ্ন নেই, বড়ো স্বপ্নের সাহস নেই, তাতে সহযোগিতা করার কেউ নেই। সত্যি, আমি অহমিকা দেখাচ্ছি না, ওই ব্যাকরণটি লেখা হলে গর্ব করতে পারতো বাঙালি; কিন্তু তা যদি আগামী দু-দশকে লেখা না হয়, তবে হয়তো কয়েক শতাব্দীতে লেখা হবে না।

মা রা : আপনি নানান ধরনের গবেষণা করেছেন। নারী, নারীবাদ, নারীবাদী সাহিত্য ইত্যাদি বিষয় নিয়ে এখন আপনি গবেষণায় লিপ্ত। এ-বিষয়টি আপনার জন্য নতুন মনে হয়েছে আমার কাছে। এ-গবেষণার নেপথ্য কারণ কিংবা কি তাগিদ কাজ করেছে?

হুমায়ুন আজাদ : নারীবাদের প্রতি আমার আগ্রহ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থা থেকেই। ১৯৬৬ থেকেই নারীবাদী নানা বইপত্র কিনেছি, কোনো কোনো বই শুধু কিনেছি, পড়ি নি; বিদেশে থাকার সময়ও বেশ কিছু বইপত্র কিনেছি, কিছু পড়েছি কিছু পড়ি নি। পশ্চিমের নারীবাদীদের সক্রিয় আন্দোলনের সংবাদও রেখেছি। ১৯৮৭ তে আমার আগ্রহ জাগে বইগুলো ভালো করে পড়ার; এবং একটি বাহ্যিক চাপও ছিলো— কলাম লেখার চাপ। কলাম লেখার কথা ভাবলেই আমার জ্বর আসতো; তখন নারীবাদী লেখা পড়ছি আমি, আর পূর্বাভাস-এর বাবু অনুরোধ জানায় নারী সম্পর্কে কিছু লেখার। আমি দ্য বোভোয়ার, মিলেট, ফ্রাইডান, গ্রিয়ার ও অন্যদের বইয়ের পর বই পড়তে থাকি, বোধ করতে থাকি অসামান্য অনুপ্রেরণা; তাঁদের বিশ্লেষণের অভিনবত্ব ও তীক্ষ্ণতা আমাকে মুগ্ধ করে। তাঁদের সাথে মিল খুঁজে পাই নিজের; তাঁরা সবাই প্রথাবিরোধী, গত পাঁচ হাজার বছরের পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতাকে তাঁরা লাথি মেরে ভেঙে ফেলেছেন, আর আমি নিজেও তার কথা অনেক দিন ধরে ভাবছিলাম। তাঁদের বইগুলো অসামান্য; গত ত্রিশ

বছরে আমি মননশীল যতো রচনা পড়েছি, তার মধ্যে নারীবাদীদের লেখা শ্রেষ্ঠ। তাঁরা সমাজ, রাজনীতি, শিল্পকলাকে অসাধারণ অভিনব দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করেছেন, প্রায় সমস্ত গৃহীত সিদ্ধান্ত বর্জন করেছেন; প্রথাকে এমন বৈজ্ঞানিক ও শৈল্পিকভাবে আক্রমণ করেছেন যার তুলনা হয় না। প্রথাগত পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতাকে বদলে দেয়ার জন্যে নারীই এখন সবচেয়ে উপযুক্ত বিষয়; তাই নারী সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ বই লেখার সিদ্ধান্ত নিই, যার ফল নারী। বাংলায় লেখা নারীদের সম্পর্কে যে-সব বই রয়েছে সেগুলোর তুচ্ছতাও আমাকে আহত করেছে; আমি সাধারণত বড়ো পরিকল্পনাপ্রবণ, নারীতেও তাই করেছি। বাঙালির নারীধারণা সম্পূর্ণ ভুল, আমি দেখাতে চাই সত্যটি। আমি চাই নারীর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, যা বর্তমান পুরুষতান্ত্রিক সমাজে অসম্ভব; তাই এ-সভ্যতাকেই বদলে দিতে হবে। সভ্যতা বদলানোর মহাপরিকল্পনার বড়ো অংশ নারী। বাংলাদেশে যে-নারীচর্চা হয়েছে, তা আমাকে আহত করেছে। এ-দেশে সামাজিক সুবিধাভোগী কয়েক দল নারী নানা রকম নারীসংঘ করেন, তাঁদের নারীনির্ভর ব্যবসা আমার কাছে খুব রুগ্ন কাজ বলে মনে হয়েছে। তাঁরা নানা অসরকারি সংস্থা ও দূতাবাসের কাছ থেকে প্রচুর টাকা নিয়ে বিশপঁচিশ পাতার নিউজপ্রিন্টের পুস্তিকা ছাপেন, নিজেরা লাভবান হন। নারী বেরোনোর পর একটি দাতাসংস্থার এক উচ্চ কর্মকর্তা আমার সাথে যোগাযোগ করে জানান তঁদের সংস্থা অন্তত ৯০টি নারীগবেষণা প্রকল্পে বেশ কয়েক কোটি টাকা দিয়েছে, সুবিধাভোগী নারীরা নানা রকম প্রতিবেদন তৈরি করছেন; কিন্তু নারী থেকে তিনি যা জানতে পেরেছেন কোটি কোটি টাকার প্রকল্প থেকে তিনি তা জানতে পারেন নি। তিনি আমাকে একটি প্রকল্প দিতে বলেছিলেন, আমি দিই নি। নারীর এখন খুবই মুক্তি দরকার, নারী এখন অত্যন্ত আক্রান্ত; মৌলবাদ নারীর বিরুদ্ধে তার সমস্ত চক্রান্ত শানাচ্ছে। আমাদের এখানে অবশ্য কিছু স্বল্পশিক্ষিত 'রক্ষণশীলভাবে প্রগতিশীল' বুদ্ধিজীবী রয়েছেন, তাঁরা নারীবাদকে ভয় করেন; কিছু স্ত্রীবাদী নারীসংঘীরাও ভয় করেন নারীবাদকে। ওই প্রগতিশীলেরা প্রগতির নামে চান পুরুষতন্ত্র, আর স্ত্রীবাদীরা আবেদননিবেদন করেন স্বামীদের কাছে। তাঁরা নারীমুক্তি চান না, স্ত্রী হিসেবে শাড়িগয়নালিপস্টিকে সুখী পরগাছার জীবন চান।

মা রা : শিশুকিশোরদের জন্য আপনি অল্পই লিখেছেন। সেখানে একটি জিনিস লক্ষ করেছি বিষয় হিসেবে 'ভাষা' এবং 'মুক্তিযুদ্ধ' আপনি বেছে নিয়েছেন। এর পেছনে কোনো বিশেষ পরিকল্পনা কাজ করেছে কি?

হুমায়ুন আজাদ : শিশুকিশোরদের জন্য আমি আসলে অল্প লিখি নি; আমার তো মনে হয় প্রচুরই লিখেছি। আমি ঠিক শিশুদের জন্য লিখিনি, লিখেছি কিশোরদের জন্য। তাদের জন্যে আমি কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, গল্প, আত্মজীবনী, এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে লিখেছি; লিখেছি প্রথাগত

শিশুকিশোর সাহিত্যের থেকে ভিন্নভাবে। আমাদের এখানে যাঁরা একান্তভাবেই শিশুসাহিত্যিক, তাঁদের লেখার শোচনীয়তা আমাকে পীড়িত করে। আমি লিখেছি একজন আধুনিক লেখক হিসেবে, এবং কিশোরদের মনে সঞ্চারিত করতে চেয়েছি আধুনিক সৌন্দর্য, আবেগ, ও জটিলতা। প্রবন্ধগুলোর কথাই ধরা যাক;— শিশুকিশোরদের জন্যে প্রথাগতভাবে লেখা হয় 'শিক্ষামূলক' প্রবন্ধ, আমি লিখতে চেয়েছি শিল্পমূলক প্রবন্ধ; শিশুদের জন্যে যে-সব ছড়া লেখা হয়, তা অত্যন্ত হাস্যকর; আমি লিখতে চেয়েছি রূপভারাতুর কবিতা; শিশুদের জন্যে লেখা হয় ন্যাকা উপন্যাস, আমি লিখতে চেয়েছি জটিল আবেগ ও অভিজ্ঞতার উপন্যাস; একটি বইতে আমি গ্রামকে তাদের সামনে কবিতার মতো সুন্দর ও গ্রামের মতো বাস্তবরূপে তুলে ধরতে চেয়েছি; আর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে যে-দুটি বই লিখেছি, তাতে তথ্যকে আমি চেয়েছি সৌন্দর্যে পরিণত করতে। ভাষা আমার খুব প্রিয়, আমি ভাষার মধ্যে বাস করি; বাংলা ভাষা আমার জন্যে শুধু ভাষা নয়, তা আমার বাসভূমি। মুক্তিযুদ্ধ আমার জীবনের প্রধান অভিজ্ঞতা, তবে মুক্তিযুদ্ধ আমার লেখার প্রধান বিষয় নয়; তবে কিশোরদের জন্যে, এবং আমার প্রথম উপন্যাসটি লিখেছি আমি মুক্তিযুদ্ধ নিয়েই।

মা রা : আপনি আবুকে মনে পড়ের কথা বলছেন?

হুমায়ুন আজাদ : হ্যাঁ, এটি একটি চারবছরের শিশুর স্মৃতিচারণ, এর উপস্থাপনা ভিন্নরকম।

মা রা : আপনার কয়েকটি গল্প আমি পড়েছি। মনে হয়েছে গল্পগুলো আপনার কবিতারই একধরনের সম্প্রসারণ। আপনি উপন্যাস লেখার কথা ভাবছেন এরকম খবর পেয়েছি— আসলে কি আপনি উপন্যাস লিখছেন?

হুমায়ুন আজাদ : আমি উপন্যাস এখন লিখছি না, তবে লিখবো। কিশোরদের জন্য আমি একটি উপন্যাস লিখেছি; এবং উপন্যাস লেখার কথা ভাবছি। আমার গল্পগুলো ভিন্ন ধরনের, রূপক ও প্রতীকধর্মী, তার লক্ষ্য মজাদার বাস্তবতা উপস্থাপন নয়, গভীর সত্য উপস্থাপন। উপন্যাস লিখলে আমি অমন উপন্যাসই লিখবো, বাহ্যবাস্তবতার উপাখ্যান লিখবো না। অবিকল বাস্তবতার কাল অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে।

মা রা : আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন দীর্ঘদিন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে আপনার কাছে আমি একটি প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই— আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ নেই, এরকম একটা অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এর পেছনে কারণ রাজনৈতিক অস্থিরতা। এছাড়াও কি আপনার কাছে কখনো মনে হয়েছে শিক্ষার এবং ছাত্রসমাজের মানসিকতার অবমূল্যায়ন ঘটেছে?

হুমায়ুন আজাদ : যে-দেশে বেঁচে থাকার পরিবেশ নেই, সেখানে যে শিক্ষার পরিবেশ থাকবে না এটাই তো স্বাভাবিক। নষ্ট রাজনীতি আমাদের জীবন ও শিক্ষা ও স্বপ্নকে নষ্ট করে ফেলছে। তবে আমাদের শিক্ষার লক্ষ্য যে কখনো খুব উন্নত ছিলো, তা নয়; আমাদের শিক্ষা কখনোই সৃষ্টিশীল ছিলো না। 'ছাত্রসমাজের মানসিকতার অবমূল্যায়ন'-এর অর্থ কি তারা এখন অমেধাবী হয়ে গেছে? তারা মেধাহীন হয়, মানুষের বিকাশের জন্যে মগজের ভূমিকার থেকে সমাজের ভূমিকা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ; আমাদের সমাজরাষ্ট্রই শিক্ষার বিরুদ্ধে।

মা রা : রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে যাই : সমগ্র রবীন্দ্রনাথ, খণ্ডিত রবীন্দ্রনাথ নয়, আপনার দিবস রজনী চিন্তা-কল্পনার সঙ্গে বর্তমানে কতটুকু সংযুক্ত?

হুমায়ুন আজাদ : রবীন্দ্রনাথ আছেন জলবায়ুর মতো; তবে অনেকে যেমন কোনো এক কেন্দ্র-ব্যক্তি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হন, আমি তেমন হই না। অনেক দিন আমি তাঁর কবিতা-গল্প-উপন্যাস পড়ি নি, কেননা আমি যা করছি বা ভাবছি, তার জন্যে তা প্রাসঙ্গিক নয়। তাঁর বহু কবিতা আমার মুখস্থ, অন্তত আংশিক; তাই মনে মনে ওগুলো আমি পড়তে পারি। কবিতা বই খুলে পড়তে ইচ্ছে হলে আমি সুধীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ ও আধুনিকদের পড়ি। নারী লেখার সময় তাঁর অনেক প্রবন্ধ আবার পড়েছি, একবার পড়েছিলাম ছাত্রাবস্থায় রবীন্দ্রপ্রবন্ধ/রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা লেখার সময়। রবীন্দ্রনাথের নারীবিষয়ক সমস্ত মন আমি বাতিল করে দিয়েছি, কেননা তা সম্পূর্ণরূপে ভিক্টোরীয়, নারীর বিকাশবিরোধী। যে কোনো কাজ করতে গেলেই রবীন্দ্রনাথের কাছে যেতে হয়, তাঁকে স্বীকার বা অস্বীকার করার জন্যে; তবে তাঁর সাথে আমার মতের অমিলই বেশি।

মা রা : কবিতা পড়তে চাইলে, যেমন আপনি বললেন, জীবনানন্দ দাশের, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা পড়তে চান। গান শোনার জন্যে আপনি কি রবীন্দ্রনাথের কাছে যান না প্রথম পছন্দ হিসেবে?

হুমায়ুন আজাদ : গান অবশ্যি আমি খুব কমই শুনি, প্রায় শোনাই হয় না।

মা রা : আপনি এক জায়গায় বলেছেন সাহিত্যে রাজনীতি থাকবে, তবে সাহিত্য কোনো বিশেষ দলের শ্লোগান হবে না। গ্রহণযোগ্য কথা বটে; কিন্তু লেখককে সমাজে বাস করতে হয় বলে তাঁর সাহিত্য কোনো না কোনো পক্ষের প্রতিনিধিত্ব করে, তা কি আপনি বিশ্বাস করেন? ঐ প্রতিনিধিত্ব শ্লোগান না হয়েও বিশেষ কোনো দলের চিন্তার অনুকূলে যেতে পারে না?

হুমায়ুন আজাদ : এটা হচ্ছে ক্ষুদ্র সমাজে ক্ষুদ্র লেখকদের সমস্যা ও স্বভাব। দেশের অনেকগুলো রাজনীতিক দল রয়েছে, এর একটিকে বিশ্বাসে, অবিশ্বাসে, ব্যক্তিগত স্বার্থে আমার সমর্থন করতে হবে, সমর্থন করে টিকে থাকতে হবে বা পেতে হবে পুরস্কার ও নানা সুবিধা, এটা ক্ষুদ্র গার্হস্থ্য লেখকদের চরিত্র। আমাদের মতো নষ্ট সমাজে একেই মনে করা হয় স্বাভাবিক। কিন্তু এটা লেখকের

চরিত্রহীনতা, মহৎ প্রকৃত লেখকের কাছে এটা প্রত্যাশা করি না। সোভিয়েত ইউনিয়নে কোটি টন সাহিত্য লেখা হয়েছে দলের স্তব করে, এখন তার কী হবে? আমাদের দেশে লেখকেরা ক্ষুদ্র, তাঁরা টিকে থাকার জন্যে কেউ মুজিবের, পবিত্রভাবে বলেন 'বঙ্গবন্ধু', কেউ জিয়ার 'দর্শন' প্রচার করেন, এক সময় একদল জিন্নাকে— তারা অতি পবিত্রভাবে বলতো 'কায়েদে আজম'— নিয়ে মাতামাতির একশেষ করেছে, এসবই ক্ষুদ্রতা ও সুবিধাবাদিতার লক্ষণ। আমাদের দেশে যে-সমস্ত রাজনীতিক দল রয়েছে, সে-সব দলের যে-রাজনীতিক চিন্তা, তা কোনো প্রকৃত লেখকের পক্ষেই সমর্থন করা সম্ভব নয়। দল করলে লেখা ছেড়ে দল করাই ভালো। দল এক সাংঘাতিক দানব, তা সৃষ্টিশীলতার বিরোধী, তা লেখকের আত্মায় মিথ্যা ঢুকিয়ে দেয়, দলবাদী লেখক মিথ্যা আবৃত্তি করেন। রাজনীতিকেরা ক্ষমতালোভী নিম্নমানের মানুষ, তারা ক্ষমতার জন্যে নানা আদর্শের বুলি আবৃত্তি করে, কিন্তু বিশ্বাস করে না; একজন প্রকৃত লেখক কী করে করবেন এমন কপটতা? আর তিনি যদি বিশ্বাস করেন, তাহলে বুঝতে হবে তিনি নির্বোধ, রাজনীতিক প্রতারণাকে তিনি বিশ্বাস করেছেন। লেখকের কাজ মানুষের বিকাশের, সৃষ্টিশীলতা ও মননশীলতার পক্ষে থাকা, ক্ষমতালব্ধ ও লিপ্সুদের পক্ষে থাকা নয়। লেখক হবেন রাজনীতিকদের থেকে অনেক অগ্রসর, একদিন তাঁকে অনুসরণ করবে অন্যরা; কিন্তু লেখক যদি অনুসরণ করা শুরু করেন রাজনীতিকদের, তাহলে তিনি করেন সুবিধাজনক আত্মহত্যা। রাজনীতিক দল চিন্তায় বিশ্বাস করে না, শ্লোগানে বিশ্বাস করে, তাই লেখকের কাছে শ্লোগানই চায়, চিন্তা চায় না। আমাদের লেখকেরা ক্ষুদ্র : তাঁরা কেউ বঙ্গবন্ধুবাদী, কেউ জিয়া-খালেদাবাদী, কেউ গোলামবাদী, এমনকি আজো কেউ কেউ জিন্নাবাদী। এটা নিকৃষ্ট সমাজ, রাজনীতি, ও লেখকের ক্ষুদ্রতার পরিচায়ক। আমার কাছে একজন রাজনীতিক বীরও একজন ক্ষুদ্র ব্যক্তি।

মা রা : কিন্তু রাজনীতিকেরা তো রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে একটা পরিবর্তন আনেন। রাজনীতি না থাকলে, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব না থাকলে আজকে কিন্তু আমরা দেশ স্বাধীন করতে পারতাম না। আপনি বলেছেন, একজন বীরও একজন ক্ষুদ্র ব্যক্তি!

হুমায়ুন আজাদ : অবশ্যই ক্ষুদ্র ব্যক্তি, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। রাজনীতিকেরা আন্দোলন করে? তারা পরিবর্তন ঘটায়? এগুলো সবই প্রতিভাস মাত্র : ওই কাজগুলো করে জনগণ, সাধারণ মানুষ ও সৃষ্টিশীল প্রতিভাবানেরা, সুফল ভোগ করে রাজনীতিকেরা। পৃথিবীতে অজস্র রাজ্য জন্মেছে, ম'রে গেছে, কতো রাজা ভিখিরির থেকেও লুপ্ত হয়ে গেছে; রাজনীতিক বীরেরা কৃত্রিম বীর, ইতিহাসের পরিহাস। একটি মহৎ বই লেখা একটি রাষ্ট্র স্থাপনের থেকে অনেক বড়ো কাজ, একটি বড়ো আবিষ্কার অসংখ্য রাষ্ট্রসৃষ্টির থেকেও মহৎ কাজ। একজন

রবীন্দ্রনাথ বা আইনস্টাইনের কাছে তুচ্ছ কি নয় অসংখ্য রুজভেল্ট-চার্চিল-স্ট্যালিন-দ্য গল? ইতিহাসের পরিহাসে যে-কোনো আহাম্মক বীর হয়ে দেখা দিতে পারে, যুগে যুগে দেখা দিয়েছে। রাজনীতি থাকবে না? রাজনীতিক না? তাহলে ওই নিকৃষ্ট লোভী অপদার্থ লোকগুলো কী করবে? তারা নিজেদের জন্যেই অপরিহার্য ক'রে রাখবে রাজনীতিকে। আমাদের দেশ স্বাধীন করেছে রাজনীতিকেরা? যারা দেশকে স্বাধীন করেছে, তারা পরিত্যক্ত; স্বাধীনতার সুবিধাগুলো নিয়েছে ও নিচ্ছে নিকৃষ্ট একপাল লোক, যাদের বলা হয় রাজনীতিবিদ।

মা রা : সাক্ষাৎকারের শেষে চ'লে এসেছি আমরা, এখন আপনার ছেলেবেলার কথা জানতে চাইবো।

হুমায়ুন আজাদ : আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় আমার ছেলেবেলা, তার কথা আমি আজকাল প্রতিদিন ভাবি যে-বাড়িতে বেড়ে উঠেছি, তার তিন দিকে পুকুর ছিলো, কচুরিপানা ছিলো, ডাহুক ছিলো, গাছ ছিলো, এসবের কথা ভাবি।

খেজুরগাছটিকে মনে পড়ে; ছেলেবেলায় যে-ঘরে ঘুমোতাম আজকাল মনে মনে প্রতিরাতে সে-ঘরে ঘুমোই। টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ শুনি। এসব নিয়ে আবেগকাতর একটি বই লিখেছি— ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না। আমাদের পরিবারটি ছোটোই ছিলো। আজ মনে হয় আমার বাবা আমার মতোই ছিলেন। তিনি আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াতেন, এবং আমাদের গ্রামের পোস্ট অফিসের পোস্টমাস্টার ছিলেন। তিনি ছিলেন খাপ-না-খাওয়া মানুষ, ব্যর্থ মানুষ, আমার থেকেও ব্যর্থ মানুষ। তাঁর ছিলো নিজস্ব ভালোমন্দবোধ, তাঁর ভালো লাগা জিনিসগুলো আসলেই ভালো ছিলো, খারাপ লাগা জিনিসগুলো ছিলো আসলেই খারাপ। তিনি নিঃসঙ্গ মানুষও ছিলেন। এ-বছর জানুয়ারিতে তিনি মারা গেছেন, তাঁর মতে সাতাশি আমার মতে আশি বছর বয়সে। আজকাল আমি মাঝেমাঝে আমার গলার আওয়াজে বাবার গলার আওয়াজ শুনতে পাই। বাবা আমাকে খুব আদর করতেন, কিন্তু ভাব দেখাতেন যেন আমাকে আদর করেন না; স্নেহ দেখাতেও তার লজ্জা লাগতো, সন্তানকে কোলে নিতেও তাঁর লজ্জা লাগতো। আমার মা ছিলো, মাকে আমরা তুমিই বলি, পৃথিবীর সমস্ত মার মতোই দায়িত্বশীল; সেই চালাতো আমাদের সংসার। বাবার আয়ে চলতো না আমাদের, চলতো মার আয়ে; মা উত্তরাধিকার সূত্রে বেশ সম্পত্তি পেয়েছিলো, তাতে আমাদের বেশ চলতো। আমার বড়ো এক বোন ছিলো, পানু, কয়েক বছর আগে মাটি ও মহাকালের অংশ হয়ে গেছে; তার সাথে আমার ভাবের শেষ ছিলো না।

আমি প্রথম পড়েছি আমাদের গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। আমাদের গ্রাম রাঢ়িখাল খুব বিখ্যাত, জগদীশচন্দ্র বসু জন্ম নিয়েছিলেন বলে। আমাদের গ্রামের লোকেরা তাঁকে নিয়ে গৌরব করতো, তারা স্যার জে সি বোস ইনস্টিটিউশন নামে

একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলো। আমি সেখানেই পড়েছি, প্রবেশিকা পাশ করেছি সেখান থেকে। উঁচু ভিটের ওপর লম্বা টিনের ঘর ছিলো আমাদের স্কুলটি। স্কুলে হেঁটে যেতাম শুকনো কালে, বর্ষায় নৌকো করে। সেভেনে ওঠার পর বাবা আমাকে একটি কোষানৌকা কিনে দেন, আমি ঝড়ের মধ্যেও ওই কোষা বেয়ে স্কুলে গেছি, দেখেছি কেউ আসে নি, শুধু আমি একা।

ছেলেবেলায়ও আমি এমনই ছিলাম। আমার সব সময়ই প্রিয় দু-তিন বন্ধু থাকে, অবন্ধু থাকে অনেক, ছেলেবেলায়ও তাই ছিলো; বিল্লাল ছিলো আমার প্রিয় বন্ধু, যে আমাকে জীবনের অভিজ্ঞতা গোপনে সরবরাহ করতো। কিশোরী বান্ধবীও ছিলো কয়েকজন, যারা আমি বললে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতো, কারো কারো চোখে বঙ্গোপসাগরের থেকেও বড়ো অশ্রুবিন্দু ছিলো। কতো দিন তাদের দেখি না! মনে পড়ে বড়োরাও আমাকে স্নেহের সাথে সমীহ করতেন, জানতেন আমি অন্যদের মতো নই। আমার বিকাশ ঘটেছে একটি বড়ো আদর্শ সামনে রেখে চারপাশের সাথে প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে। আদর্শ ছিলেন বিদ্যাসাগর। বাল্যকালের অনেক শ্রদ্ধেয় আজ আর আমার শ্রদ্ধেয় নয়, কিন্তু বিদ্যাসাগর আছেন অটল। চারপাশের সাথে ছিলো আমার গোপন প্রতিযোগিতা— আমার থেকে যারা ভালো ছাত্র ছিলো ছেলেবেলায় তাদের আমি পেরিয়ে যেতে চেয়েছি, একদিন পেরিয়েছি। কোনো প্রতিযোগিতায়ই আমি সাধারণত পরাভূত হইনি, তবে অনেক বছর ধরে আমি প্রতিযোগিতাকে ঘেন্না করি। লেখার বেলাও একটি গোপন প্রতিযোগিতা ছিলো। আমি যখন লিখতে শুরু করি, তখন আমার সমবয়সের ও অনেক বড়ো যাদের লেখা বেরোতো, যারা বেশ লিখতো, যাদের নাম ছাপা হতো বড়ো বড়ো অক্ষরে, অথচ আমার লেখা ছাপা হতো না, তারা আজ কতো পিছিয়ে। এ নিয়ে একটি প্রতীকী কবিতা আছে আমার, নাম 'শালগাছ', যাতে একটি গাছ অন্যান্য গাছের আধিপত্য ভেদ করে মাথা তুলে দেখেছে— যতোই ওপরে যাই নীল যতোই গভীরে যাই মধু।

আমাদের বাড়ি থেকে বিশাল আড়িয়ল বিল দেখা যেতো। সবুজের মধ্যে সুখের মধ্যে আমি বেড়ে উঠেছি। সে-সুখ বিলাসের নয়, প্রকৃতি ও কল্পনার ও মানুষের সুখ। পাখির দিকে তাকিয়ে থাকার সুখ, পানিতে লাফিয়ে পড়ার সুখ, যার কোনো তুলনা হয় না। অপু ও আমার মধ্যে বেশ মিল ও অমিল রয়েছে; অপু গ্রাম্য বালক মিলে গেছে গাছপালার সাথে, আমি মিলে না গিয়ে সৌন্দর্য দেখেছি। পল্লীর প্রকৃতি, মানুষ, গান আমার কাছে এসেছে সৌন্দর্য হয়ে; কিন্তু আমি ওই জীবনে থাকবো, ওই সুর উঠবে আমার কণ্ঠ থেকে, তা মনে হয়নি।

আমি প্রথম উপন্যাস পড়েছিলাম বোধ হয় সেভেনে পড়ার সময়, নাম আনোয়ারা; বইটি শেষ করতে পারি নি, বাবা নিয়ে গিয়েছিলেন। তবে আজো নায়কের স্যান্ডল ও নায়িকার চুল বদলের চমক মনে ঝলসে ওঠে। আজকের মতো

তখনো শহর থেকে খারাপ জিনিসই বেশি যেতো গ্রামে, ভালো জিনিস যেতো না। আমি যা পেতাম তাই পড়তাম, আমাদের গ্রামের নিম্ন চাকুরেরা স্ত্রীদের জন্যে উপন্যাস নিয়ে যেতো, সব দিকেই সস্তা, পড়তাম; খুব নিকৃষ্ট লেখকদের নাম জানতাম, ভালো লেখকদের নাম জানতাম না। গ্রামে আমি জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব, শামসুর রাহমানের নাম শুনি নি; কোনো বইয়ে বা পত্রিকায় তাঁদের নাম পাই নি, তবে সৌরীন্দ্রমোহন, নীহাররঞ্জন, এমনকি জাহানারা আরজু আর জামালউদ্দিন মোল্লার নামও পেয়েছি। ইত্তেফাকে সম্ভবত আল মাহমুদের লেখা প্রবাল দ্বীপ নামের জামালউদ্দিন মোল্লার একটি বইয়ের আলোচনা পড়ে মনে হয়েছিলো তিনিই সবচেয়ে বড়ো কবি। এমন সব মিথ্যা সংবাদ, আজকের মতো, তখনো যেতো।

আমার ছেলেবেলার একটি ঘটনা আমাদের পরিবারের সবাই ভুলে গেছে, মাবাবাও ভুলে গিয়েছিলো, আমি ভুলি নি। আমার ছোটোভাই কালামের মৃত্যু। সে আমার গায়ে গায়ে লেগে থাকতো, একদিন অঘ্রাণে কলেরায় মরে গেলো, আমার চোখ কয়েক বছর ধরে বিষণ্ন কুয়াশায় ঢেকে গেলো। ওকে নিয়ে আমি কবিতা লিখেছি 'অনুজের কবরপার্শ্বে' নামে, আমার গোপন প্রিয় কবিতা; আর ওর মৃত্যুর ঘটনা আমি লিখেছি 'সব চেয়ে যে ছোটো পিঁড়িখানি' নামে ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না; লেখার সময় আমার কণ্ঠ রোধ হয়ে গিয়েছিলো, ওই লেখাটি আমি নিজেও পড়তে পারি না।

মা রা : এই মধ্যচল্লিশে এসে আপনার জীবন আপনার কাছে কেমন লাগছে?

হুমায়ুন আজাদ : অত্যন্ত সুখকর, কিন্তু নিরর্থক বলে মনে হয়। চারপাশে জীবনের ব্যাকুলতা, শিশুর মর্মান্তিক মধুর হাসি, বাস্তব মানুষের ইঁদুর-দৌড়, আর বুড়োদের জীবনপিপাসা দেখে হাসি পায়, কেননা এর সবই ব্যর্থ হয়ে যাবে। মৃত্যুই শুধু সফল পৃথিবীতে।

মা রা : এটা খুবই সত্যি যে জীবন নিরর্থক, কিন্তু মানুষ অর্থ আরোপ করে বেঁচে থাকে।

হুমায়ুন আজাদ : মানুষ অনেকটা ঝিনুকের মতো। ঝিনুক যেমন নিজের ব্যাধিকে মুক্তোয় রূপান্তরিত করে, মানুষ তার ওপর চেপে থাকা ভারী নিরর্থকতাকে অর্থপূর্ণ করার জন্যে গড়ে তুলেছে শিল্পকলা, বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজ, রাষ্ট্র। আর বেঁচে থাকার মধ্যেই রয়েছে আশ্চর্য সুখ।

মা রা : বেঁচে থাকার কোনো বিশেষ দার্শনিক অর্থ আপনার মধ্যে কি ক্রিয়া করে?

হুমায়ুন আজাদ : বেঁচে থাকার 'দার্শনিক অর্থ' শুনতে খুব গুরুগম্ভীর মহৎ ব্যাপার বলে মনে হয়; কিন্তু এটা একধরনের স্বৈরাচার, মানুষকে শেকলে জড়িয়ে ফেলার সুভাষণ হচ্ছে জীবনের দার্শনিক অর্থ। ভাবাদর্শগত জীবনযাপনের জন্যে

কয়েক হাজার বছর ধরে পীড়ন করা হচ্ছে মানুষকে, রটানো হয় যে ভাবাদর্শগত জীবনযাপন খুব উত্তম। মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, আর চাপানোর চেষ্টা চলছে অসংখ্য ভাবাদর্শ। মানুষ জন্মেছে জীবনযাপনের জন্যে, ভাবাদর্শযাপনের জন্যে নয়। এটা আমার কাছে খুব হাস্যকর মনে হয় যে, মানুষ মানুষ হিসেবে বাঁচবে না, বাঁচবে ভাবাদর্শগতভাবে, বা তথাকথিত দার্শনিক অর্থসম্পন্নভাবে; অর্থাৎ মানুষ বাঁচবে বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ছক অনুসারে। মানুষ বাঁচবে মানুষ হিসেবে, আর সব দর্শনের চূড়ান্ত অর্থ হচ্ছে কবর।

মা রা : মৃত্যুচিন্তা আপনাকে আক্রান্ত করে?

হুমায়ুন আজাদ : সতেরো-আঠারো বছর বয়সে চারদিকে আমি মৃত্যুর মুখ দেখতে পেতাম, ভয় পেতাম, কেননা আমার তখন স্বপ্ন ছিলো; এখন তার মুখ দেখি না, কেননা আমার সে-স্বপ্ন নেই। এখন বেঁচে আছি, বেঁচে থাকতে চাই, আশি বছর বয়সের আগে মরতে চাই না; তবে বেঁচে থাকার জন্যে আমার খুব ব্যাকুলতা নেই।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন : মারুফ রায়হান
মাটি, ডিসেম্বর ১৯৯২

কবিদের মুখোমুখি :
হুমায়ুন আজাদ

১ আপনি আপনার কবিতাচর্চায় কোন ধরনের উত্তরাধিকারের প্রতি নতজানু? অর্থাৎ যে-আধুনিক ভাষায় আপনি কবিতা লেখেন তার নিশ্চয়ই একটা ধারাক্রম, একটা উত্তরাধিকার আছে— এই উত্তরাধিকার কীভাবে অনুসৃত হয়েছে আপনার বোধে, চেতনায়, কাব্যভাবনায়?

হুমায়ুন আজাদ : প্রথমেই আমি 'উত্তরাধিকার' শব্দটির ঠিক অর্থটি শিখে নিতে চাই, কেননা একটু পরই রয়েছে 'নতজানু'র মতো ভীতিকর একটি শব্দ। শব্দটি ভীতিকর আমার কাছে, কেননা আমি কোনো কিছুর কাছেই নতজানু নই, নতজানু হওয়ার স্বভাব নিয়ে আমি জন্মি নি, আর নতজানুপরায়ণ সমাজ আজো তার ধর্মে আমাকে দীক্ষিত করতে পারে নি। একটি অভিধান বলছে 'উত্তরাধিকার'-এর অর্থ 'পূর্বপুরুষগণের ধনসম্পত্তিতে পরবর্তী পুরুষগণের অধিকার', আরেকটি বলছে- 'আত্মীয়তার দাবিতে মৃতের সম্পত্তিতে অধিকার'। এই যদি অর্থ হয়, নতজানুর কথা ওঠে না তাহলে, কথা ওঠে সম্ভোগের; পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া ধনসম্পত্তি পেলে সুখে সম্ভোগ করে একদিন দেউলে হয়ে ওঠা যায়। কবিতা, সাহিত্য, শিল্পকলায় এমন উত্তরাধিকার বলে কিছু নেই; কোনো কবির জন্যে তাঁর কবিপূর্বপুরুষ কোনো সম্পত্তি রেখে যান না, যা বসে বসে সম্ভোগ করা যেতে পারে। প্রত্যেক কবিপূর্বপুরুষ আসলে উত্তরপুরুষদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে যান, দুরূহ করে রেখে যান তাঁদের সমস্ত পথঘাট, সমস্ত পুঁজি নিজেরাই নিঃশেষ করে যান; পরবর্তীদের পথ হয় দুরূহতর, এবং পুঁজিশূন্যতা সম্বল করেই তাঁদের কাজ শুরু করতে হয়। বাঙলা সাহিত্যের জন্যে চণ্ডীদাস, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ বা সুধীন্দ্রনাথ প্রচুর সম্পদ রেখে গেছেন, বাঙলা সাহিত্য দেখাতে পারে এ হচ্ছে আমার পুঁজি, আর বাঙালিও দেখাতে পারে যে জাতিগতভাবে তার পুঁজিটা খারাপ নয়; কিন্তু আমার জন্যে, যখন আমি কবি, যখন আমি কবিতা লিখতে চাই, তখন দেখতে পাই আমার জন্যে কিছুই রেখে যান নি, যা আমি অবলীলায় ব্যবহার করে নিজেকে সৃষ্টি করতে পারি। শিল্পসাহিত্যে উত্তরাধিকার খুবই বাজে কথা, যার কোনো অর্থ হয় না, প্রতিটি নতুন কবিকে সৃষ্টি করতে হয় নিজেকে; একজন রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী

কবির উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পদ নয়, তাঁর জন্যে বিপদ। তবে 'ধারাক্রম' তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ। যেদিন আমি, বাল্যবয়সে, কবিতা লিখতে শুরু করেছিলাম, যে-সব কবিতা ছাপার কথা আমিও ভাবি নি, অন্যদের মতোই আমিও বুঝি নি বাংলা কবিতার ধারাক্রমে আমি কোথায় পড়ি। ছেলেবেলায়, অনেকের মতো, আমিও কামিনী রায় বা গোবিন্দ দাস বা যতীন্দ্রমোহন বা রবীন্দ্রনাথের মতো লিখতে চেষ্টা করেছি, কেননা কবিতার আদর্শের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় ঘটে পাঠ্যপুস্তকে, যা সাধারণত ভরা থাকে অকবিদের অকবিতায়। কিশোর বয়সের ওই বিভ্রান্তি কেটে যায়, ষোলোসতেরো বছর বয়সে, যখন আধুনিক কবিতার সাথে পরিচয় ঘটে, জানতে পারি পাঠ্যপুস্তকের বাইরে অনেক কবি রয়েছেন, তাঁরা অনেক ভিন্ন, কায়কোবাদ, ফজলুল করিম, কামিনী বা কালিদাস রায়ের থেকে; তখন আমার কবিতার পৃথিবীটিই বদলে যায়। বাঙলা ভাষায় যে এমন কবিতা লেখা হয়ে আছে, তা জানতে পেরে অভিভূত হই; একদিন 'আজান' বা 'জিন্দা পাকিস্তান' বা 'খেয়াপারের তরণী'কেই মনে হতো কবিতা; আধুনিক কবিতার সাথে পরিচয়ের পর সমস্ত পাঠ্যপুস্তকি কবিতা বাতিল হয়ে যায় আমার মন থেকে। তবে তিরিশি আধুনিক কোনো কবিকে আমি অনুকরণ করি নি, যে-দু-একটিতে করেছিলাম সেগুলো ছাত্রজীবনেই হারিয়ে ফেলেছি; আমি নিই তাঁদের আধুনিক সংবেদনশীলতা বা চৈতন্যটুকু; পরে পশ্চিমের আধুনিক কবিতা ও আধুনিকতার বহু ব্যাখ্যার সাথে পরিচিত হয়ে আধুনিক সংবেদনশীলতাকে আমি আমার কবিতার চৈতন্য করে তুলি। পশ্চিমের আঠারোউনিশ শতকের রোম্যান্টিসিজম, উনিশবিশ শতকের নানা কাব্যান্দোলন নানাভাবে কাজ করে

আমার মধ্যে; এমন এক বাংলা ভাষায় আমি কবিতা লিখতে চেষ্টা করি, যাতে প্রকাশ পেতে পারে একজন আধুনিক আন্তর্জাতিক মানুষের আবেগ, উপলব্ধি, স্বপ্ন, সৌন্দর্যবোধ।

২ আচ্ছা কখনো কি আপনার মনে হয়েছে রবীন্দ্রনাথ অনেক বিপুল, ঐশ্বর্যময় ও অফুরন্ত হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তীকালের গৌণ-অগৌণ আধুনিক বঙ্গীয় কবিকুল তাঁর কবিতায় খুব একটা স্বস্তিবোধ করেন নি! কেন করেন নি? রবীন্দ্রকবিতা থেকে এই শতকের সূর্যাস্তলগ্নে আধুনিক কবিদের নতুন ক'রে প্রাণিত হবার কোনো অবকাশ তৈরি হবে বলে মনে হয় আপনার?

হুমায়ুন আজাদ : প্রশ্নটিতে বেশ গোলমাল রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। প্রশ্নটি জ্ঞাপন করছে যে রবীন্দ্রনাথ যেহেতু 'বিপুল, ঐশ্বর্যময় ও অফুরন্ত', তাই তাঁকে নিয়ে স্বস্তি বোধ করার কথা, কিন্তু তা বোধ করেন নি পরবর্তীরা, যা খুব খারাপ। আমার তো মনে হয় অন্য রকম; রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে অস্বস্তিবোধ করাই স্বাভাবিক পরবর্তী প্রতিভাদের পক্ষে। পূর্ববর্তী প্রতিভা সব সময়ই পরবর্তী প্রতিভাদের কাছে অস্বস্তির কারণ, শুধু প্রতিভাহীনেরাই পূর্ববর্তী প্রতিভাকে আরামে স্বস্তির সাথে উপভোগ করেন। কুমুদরঞ্জন থেকে সুফিয়া কামালের কাছে রবীন্দ্রনাথ অস্বস্তিকর নন, এবং অত্যন্ত স্বস্তিকর সুখকর প্রমোদজনক; রবীন্দ্রনাথ তাঁদের জন্যে স্বপ্ন, আবেগ, কামনা, বাসনা সবই তৈরি করে দিয়ে গেছেন, ভাষা আর ছন্দও দিয়ে গেছেন, তাই তাঁরা স্বস্তির সাথে নিরুদ্বেগে কবিতা লিখতে পেরেছেন, একবার ভাববারও অবকাশ পান নি তাঁদের ওই ছন্দোবদ্ধ শব্দগুলো কবিতা হলো কিনা? আধুনিকেরা, সতেরোআঠারো বছরের অসামান্য তরুণেরা, যখন কবিতা লিখতে শুরু করেন, তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁদের জন্যে ছিলেন বিপজ্জনক; কেননা তাঁদের অতিক্রম করে যেতে হবে রবীন্দ্রনাথের মতো বিপুল ঐশ্বর্যময় ও অফুরন্ত'কে। অস্বস্তির কারণ এটিই। রবীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিক বিশ্ব এতো বড়ো যে তার সীমা পেরিয়ে অন্য বিশ্বের খোঁজ পাওয়া কঠিন; তবে আধুনিকেরা ওই কঠিন কাজটি করেছিলেন, বাংলা ভাষায় তাঁরাই প্রথম লিখেছিলেন বিশশতকের সংবেদনশীলতা। তাঁরা সৃষ্টি করেছিলেন এক অভিনব শিল্পকলা, এক ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য দেখা দিয়েছিলো বাংলায়। আমি রবীন্দ্রনাথের কবিতা উপভোগ করি, তবে রবীন্দ্রভক্তরা যেগুলোতে গলেন সেগুলো নয়, কিন্তু ওই কবিতা দিয়ে প্রাণিত হই এমন বলা যাবে না; তাঁরা কবিতা দিয়ে প্রাণিত হয়ে, বিশশতকের শেষ দশকে, নতুন কবিতা সৃষ্টির কোনো অবকাশ আছে বলে আমার বোধ হয় না। শুধু তাঁর কবিতাই নয়, বাঙলা ভাষার হাজার বছরের কবিতা দিয়েও প্রাণিত হয়ে নতুন কবিতা সৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই।

৩ বর্তমান কবিতাচর্চা বিষয়ে সাধারণ মানুষ খাপ্পা। কবিতা এখন প্রায় কাউকেই লুব্ধ করে না। এই অবস্থায় ফিকশান লেখার একটা জয়জয়কারও দেখা

যাচ্ছে। ফিকশানের কারণেই কি কবিতার প্রতি মানুষের অমনোযোগ— নাকি অন্য কোনো কারণ আছে ব'লে আপনার ধারণা?

হুমায়ুন আজাদ : 'সাধারণ মানুষ' খুব 'খাপ্পা' এখন কবিতার ওপর? নিশ্চয়ই তাহলে কবিতা তাদের খুব অপমান ক'রে ছেড়েছে, বা পীড়ন করেছে, হয়তো গালে চড় মেরেছে, কান ছিঁড়ে ফেলেছে বা পাছায় লাথি মেরেছে। বা 'সাধারণ মানুষ'গণ আরো বেশি 'সাধরণ মানুষ' হয়ে গেছেন। বাঙলায় 'সাধারণ মানুষ' এক জনপ্রিয় কিংবদন্তি, তবে 'সাধারণ মানুষ' বলতে আমি যাদের বুঝি, সে ভিখিরি-চাষি-শ্রমিকরা কখনোই কবিতার কথা ভাবে না, তারা জানেও না কবিতা ব'লে কিছু আছে পৃথবীতে, তাদের আমরা এমন জীবনে দণ্ডিত করেছি যাতে কোনো শিল্পকলা নেই। আরেক অর্থে আমাদের রাষ্ট্রপতি মন্ত্রী আমলা সেনাপতি দারোগা শিল্পপতি চিকিৎসক প্রকৌশলী উকিল চোরাকারবারিরাও 'সাধারণ মানুষ', তারাও কবিতার কথা কখনো ভাবে না। ভিখিরির কিছু যায় আসে না কবিতার ছন্দ ভুল হ'লে, রাষ্ট্রপতিরও কিছু যায় আসে না কবিতা বাজে চিত্রকল্পে ভরাট হয়ে উঠলে। কবিতা চিরকালই মুষ্টিমেয় স্বপ্নগ্রস্তদের জন্যে, যারা চিরকালই একমুঠো। স্বাধীনতার পর কবিতার বই কেনার যে-পাগলামো দেখা দিয়েছিলো, যেমন এখন দেখা দিয়েছে অপন্যাস কেনার মত্ততা, তা কবিতার জন্যে অনুরাগ ছিলো না, ছিলো কবিতার ছদ্মবেশে শ্লোগানের জন্য মত্ততা। এখন কবিতার জন্যে পাগলামো কমেছে, তবে স্বপ্নমুগ্ধরা আজো আছে, হয়তো সংখ্যায় কমেছে। এখন ফিকশন বা অপন্যাসের জয়জয়কার দেখা যাচ্ছে, অর্থাৎ প্রচুর বিক্রি হচ্ছে, তবে একটা উপন্যাসের জন্যে অনুরাগ নয়; উৎকৃষ্ট উপন্যাস এ-ক্রেতাদের আকৃষ্ট করে না। পালে পালে যারা অপন্যাস কেনার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তারা যেমন সাহিত্যানুরাগী নয়, তেমনি ওই লেখকেরাও লেখক নন। আসলে এখন চলছে উপন্যাসের চরম দুর্দিন, যা কবিতার দুর্দিনের থেকেও শোচনীয়। কবিতার বই কম বিক্রি হচ্ছে, এটা কবিতার জন্যে শুভ; প্রকৃত কবিই এখন কবিতা লিখবেন, শ্লোগানলেখকেরা ও উত্তেজিতরা লিখবেন না। এটাও ঠিক বাংলাদেশ এখন তার ইতিহাসের নষ্টপর্বে রয়েছে, ভালো কিছুই আর কারো মনে স্থান পাচ্ছে না; খারাপ দখল ক'রে নিচ্ছে জীবনের সমস্ত এলাকা। কবিতা সাধারণত বিনোদনের জন্যে নয়; আর ফিকশনের আজন্ম লক্ষ্য বিনোদন। আশির দশক থেকে আমাদের দেশে একটি নবশিশুগোষ্ঠী জন্ম নিয়েছে, যারা বয়সে শিশু নয়, তারা রূপকথা আর বিনোদন চায়। ওই রূপকথা আর বিনোদন পায় তারা টেলিভিশন ও ভিডিও আবর্জনায় ও অপন্যাসে। তবে এরা যে এ-বিনোদন সামগ্রী না পেলে কবিতা পড়তো, তা নয়; কবিতা পড়েন তাঁরা যাঁরা মজার বদলে গভীর আনন্দ পেতে চান। তাঁদের সংখ্যা হয়তো কমেছে।

৪ সাহিত্যের যে-কোনো সাহিত্যের যে-কোনো গ্রহণযোগ্যতা পেতে হ'লে নিজস্ব একটি কণ্ঠস্বর প্রত্যেক লেখককে অর্জন করতে হয়; এই কণ্ঠস্বর এবং এই নিজস্বতা বাংলাদেশের কোন কোন কবি-কথক-গদ্যকারের মধ্যে লক্ষ্যযোগ্য হয়ে দেখা দিয়েছে ব'লে আপনার ধারণা?

হুমায়ুন আজাদ : 'নিজস্ব কণ্ঠস্বর' রূপকটি আমার পছন্দ নয়, 'কণ্ঠস্বর' শব্দটি উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে আমি চিৎকার শুনতে থাকি; এর চেয়ে অনেক ভালো লাগে 'নিজস্ব নিস্তব্ধতা'! কারো মৌলিকত্ব বা স্বাতন্ত্র্য বোঝানোর জন্যে 'কণ্ঠস্বর' রূপকটি চালু হয়েছিলো সম্ভবত সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের প্ররোচনায়, যাতে ভাষা হচ্ছে উচ্চারিত ধ্বনিপুঞ্জ; আমি সাহিত্যশিল্পকলায় নিঃশব্দতা বেশি উপভোগ করি। প্রশ্নটি হচ্ছে আমাদের এখানে কারা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছেন? গদ্যে পদ্যে অনেকেই গুরুত্বপূর্ণ, তালিকাটি দীর্ঘ হবে, তাই দিচ্ছি না।

৫ একটা সময়ে, রবীন্দ্রপরবরবর্তীকালে, অনুবাদচর্চার মাধ্যমে বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে বাঙলা সাহিত্যের একটি সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিলো— আন্তর্জাতিক সাহিত্যের সঙ্গে এই যোগাযোগকে অনেকেই আধুনিকতার নির্ণায়ক প্রান্ত ব'লে চিহ্নিত ক'রে থাকেন। প্রশ্নটা হলো— আজকের এই সময়ে বাংলাদেশে তরুণপ্রবীণ অনেকেই অনুবাদ করেছেন বিদেশি সাহিত্য, কিন্তু তবু আমাদের কবিতা ও সাহিত্যের দীনতা দিন দিন বাড়ছে কেন? অনুবাদ হচ্ছে, আন্তর্জাতিক শিল্পসাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগও ব্যাপক, তবু সাহিত্য আমাদের আধুনিক হচ্ছে না কেন?

হুমায়ুন আজাদ : অনুবাদ দরকার, তাতে আমরা নিজের ভাষায় বিশ্বসাহিত্যকে পাই; কিন্তু অনুবাদ কোনো সাহিত্যকে আন্তরভাবে ঋদ্ধ করে না। শেক্সপিয়রের অসংখ্য অসাধারণ অনুবাদ হ'লেও বাঙলা সাহিত্য ঋদ্ধ হবে না, অনুবাদ ঋদ্ধ হবে; শুধু সে-অনুবাদই কোনো সাহিত্যকে ঋদ্ধ করে, যা সৃষ্টিশীলদের অনুপ্রাণিত করে নতুন সৃষ্টিতে। বাঙলায় এমন অনুবাদ খুবই কম হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ বা নজরুল যদি সারা বিশ্বসাহিত্য অনুবাদ ক'রে ফেলতেন, তাহলেও বাঙলা সাহিত্যের উপকার হতো না, কেননা ওই অনুবাদ সৃষ্টিশীল নয়। দরকার সৃষ্টিশীল অনুবাদ, যা সম্পন্ন হ'তে পারে প্রতিভাবানের হাতে, যার লক্ষ্য নতুন সাহিত্যতরঙ্গ সৃষ্টি। বাংলাদেশে প্রচুর অনুবাদ হচ্ছে এখন? আমি আজো বাংলাদেশে অনুবাদিত কোনো বই প'ড়ে উঠতে পারি নি, সেগুলো শোচনীয়। তরুণপ্রবীণেরা অনুবাদ করছেন? আমার ধারণা কোনো বিদেশি ভাষা ভালোভাবে বুঝতে পারেন, এবং বাঙলা ভাষায় তা সৃষ্টিশীলভাবে প্রকাশ করতে পারেন, এমন কেউ নেই বাংলাদেশে; এখানে যাঁরা অনুবাদ করছেন, বাঙলা ভাষাও তাঁদের আয়ত্তে নেই। ওই সব অনুবাদ ব্যবসায়িক অনুবাদ, সাহিত্যিক নয়; তাই তা আমাদের অনুপ্রাণিত করতে পারে না।

৬ বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলাপ করে বোঝা যায় সাম্প্রতিক কাব্যভাষা দূষিত, এর উপমাপরম্পরা পুনরাবৃত্ত ও তাৎপর্যপ্রকাশে ব্যর্থ, এবং এখানকার কবিতায়, সরল অর্থে যাকে প্রেরণা বলে, তা নেই, এই রকম পরিস্থিতিতে বাঙলা কবিতার ভবিষ্যৎ কী?

হুমায়ুন আজাদ : বিশেষজ্ঞদের সাথে আলাপ করেছেন? চমৎকার! বাংলাদেশে বিশেষজ্ঞও রয়েছে? শুনে ভালো লাগলো, এমন দু-একজনের সাথে পরিচিত হতে পারলে আমি ধন্য বোধ করবো। কবিতার ভাষা ও ভাবনা দূষিত হয়ে গেছে, আমাদের অন্তর্জগৎ আজ দূষিত, এমন কথা আমি অবশ্য দু-একবার বলেছি। আমাদের কবিতায় যা নেই, তা প্রেরণা নয় ছন্দ নয় মিল নয়, তা হচ্ছে কবিতা; আজ কবিতার মতো রচনা পাই, কবিতা পাই না। আমরা আদিগন্ত সৃষ্টিশীলতাহীনতার মধ্যে রয়েছি, তাই আমাদের কবিতাও মৃতজাত; আর কবিতা এমন জিনিস নয় যে দশকে দশকে তার লোকোত্তর উৎসারণ ঘটতে থাকবে। এক শতকে তিনজন রবীন্দ্রনাথ, ছজন জীবনানন্দ চাওয়া দুরাশা। পেছনের দিকে, হাজার বছরের বাংলা কবিতার দিকে তাকালে দেখতে পাই শতাব্দীর পর শতাব্দী কবিতা নেই; চর্যাপদ আর শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এ পাই দশবারোটির মতো পদ, যাকে বলতে পারি উৎকৃষ্ট কবিতা, অর্থাৎ সাড়ে চারশো বছরে পাই দশবারোটি পদ; তারপর উনিশশতকের মাঝভাগ পর্যন্ত সাড়ে পাঁচশো বছরে কবিতা পাই বিশপঁচিশটির মতো বৈষ্ণব পদে, সাড়ে পাঁচশো বছরে পঁচিশটি পদ; তারপর কিছু কবিতা পাই মধুসূদনে আর বিহারীলালে। রবীন্দ্রনাথে এসে পাই দশকের পর দশক ভরে কবিতা। আর কবি নেই, একা রবীন্দ্রনাথ, এবং অনেক কবিতা। রবীন্দ্রনাথ আর আধুনিকদের মধ্যবর্তী কবিদের হাতে পাই কয়েকটি কবিতা। তারপর কবিতা পাই তিরিশি আধুনিকদের হাতে, তিন দশক ধরে। তারপর পঞ্চাশ-ষাটের দশকের কবিদের হাতে কিছু কবিতা। এখন আকাল চলছে, তবে সাড়ে পাঁচশো বছরে পঁচিশটি পদের তুলনায় অবস্থা খারাপ নয়। আজ ভালো কবিতা লেখা হচ্ছে না বলে ভবিষ্যতে হবে না, এমন ভাবার কারণ নেই।

৭ নতুন কবিদের প্রতি গত দু-দশক ধরে একটাই উপদেশ বর্ষিত হচ্ছে—ছন্দে ফেরা দরকার, ছন্দোবদ্ধ কবিতা লেখা দরকার। সেই পরামর্শ মেনে অনেকেই ছন্দে লিখছেন, কিন্তু তবু কোনো স্মরণীয় সৃষ্টি আজ পর্যন্ত ফলে নি, এর কারণ কী?

হুমায়ুন আজাদ : পরামর্শ দিয়ে ভালো কবিতা লেখানো সম্ভব হলে ভালো কবিতায় পৃথিবী ভেসে যেতো, পরামর্শকের অভাব নেই এ-গ্রহে। ছন্দ বলতে সম্ভবত মিলের কথা বলা হচ্ছে, কেননা ছন্দে কবিতা লেখা কখনো সম্পূর্ণ থেকে যায় নি। তবে ছন্দ কবিতা নয়, মিলও কবিতা নয়; কোনো শিল্পসৃষ্টির সূত্রই আগে থেকে বেঁধে দেয়া যায় না। কবিতা লেখা হচ্ছে না, কেননা কারো বুকে কবিতা

নেই। পরামর্শ মতো ছন্দোবদ্ধ গদ্য বা সাংবাদিকতা লেখা সম্ভব, কবিতা নয়। 'দরকার' কথাটিও অশৈল্পিক, 'ছন্দে ফেরা দরকার, ছন্দোবদ্ধ কবিতা লেখা দরকার'— এসব হচ্ছে হিসেবি গৃহস্থের কথা, যেনো কবিতা লেখা সাংসারিক কাজ, বিচারবিবেচনা করে চললে ভালো আয়উপার্জন হবে, সংসার চমৎকার চলবে। কবিতা দরকারে লেখা হয় না।

৮ আপনি আপনার নিজের কবিতায় মূলত কী কাজ করার চেষ্টা করেছেন? জানতে চাচ্ছি, কবিতা বিষয়ে আপনার অভিমুখিতা ঠিক কেমন? আপনার কবিতার উৎকৃষ্ট বিশ্লেষণ বা সমালোচনা হয়েছে তো?

হুমায়ুন আজাদ : আমার কবিতায় আমি কবিতা লিখতে চেয়েছি। কবিতায় যা-ই কিছু করি, সবই হচ্ছে কবিতা লেখা। আমি ধরতে চেয়েছি আধুনিক সংবেদনশীলতা, আন্তর-বাহ্যিক দুস্তরেই। আমি কবিতাকে করে তুলতে চেয়েছি নৈর্ব্যক্তিক, যা আধুনিকতার প্রধান বৈশিষ্ট্য; বিষয়বস্তুতে কবিতাকে ভরে না দিয়ে ভরে দিতে চেয়েছি কবিতায়। কবিতার থেকে বিষয়বস্তুই বেশি প্রিয় এখানে, কবিরা এখানে প্রকাশ

করেন ব্যক্তিগত আর সামাজিক কাতরতা, যা কাতরতার ওপরে ওঠে না, আর আমরা কাতরতাকেই কবিতা মনে করি। আমি কবিতাকে ব্যক্তিগত বা সামাজিক কাতরতা প্রকাশের উপায় করে তুলি নি, কবিতাকে আমি শিল্পকলা করতে চেয়েছি, যা অনুভবের জন্যে শুধু পাঠকের ব্যক্তিগত কাতরতাই যথেষ্ট নয়। এ-সময়ের একটা ভাষ্যও লিখেছি আমার কবিতায়, এবং রচিত হয়েছে প্রচুর চিত্রকল্প, সুন্দর ও ভয়াবহ। আমার কবিতার উৎকৃষ্ট বিশ্লেষণ বা সমালোচনা হয়েছে কিনা? তার কোনো সম্ভাবনা দেখি না।

৯ কবিতার ক্ষেত্রে নিরীক্ষা বলতে আপনি কী বোঝেন?

হুমায়ুন আজাদ : বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দুটি স্তর পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষা; বৈজ্ঞানিক প্রথমে উপাত্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ ঘেঁটে দেখেন অর্থাৎ পর্যবেক্ষণ করেন, তারপর উপাদানকে পরস্পরের সাথে নানাভাবে বিন্যস্ত করে দেখেন কী ফল হয়, এই হচ্ছে নিরীক্ষা। সব বিজ্ঞানে নিরীক্ষাও সম্ভব নয়, যেমন জ্যোতির্বিজ্ঞানে; জ্যোতির্বিজ্ঞানী চাঁদ, তারা, গ্রহ, নক্ষত্রকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করে নিরীক্ষা করতে পারেন না, এতে উপাদান পুনর্বিন্যাসের সুযোগ নেই। শিল্পকলায় নিরীক্ষার ধারণাটি এসেছে বিজ্ঞান থেকে, কেউ কেউ শিল্পকলাকে, উপন্যাস আর কবিতাকে, বিজ্ঞানও ক'রে তুলতে চেয়েছেন। তবে শিল্পকলার নিরীক্ষা বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষা নয়, কেননা শিল্পকলার উপাদানগুলো পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া করে না, তারা নিজেদের প্রতিক্রিয়ায় কোনো নতুন বস্তু তৈরি করে না। শিল্পকলায় নিরীক্ষা হচ্ছে নতুন বিষয়ের জন্যে নতুন আঙ্গিক খোঁজা; খুঁজে দেখা নতুন ভাষা, নতুন শব্দ বা স্তবকবিন্যাস, নতুন ছন্দ এবং বিষয় কতোটা কবিতা সৃষ্টি করছে, অর্থাৎ তা কবিতা হচ্ছে কিনা? কেউ কেউ অবশ্য পাগলামো আর বাতিকগ্রস্ততাকেও নিরীক্ষা বলে মনে করেন; আমি কবিতাকে পাগলামো ও বাতিক থেকে মুক্ত রাখতে চাই।

১০ সব শেষে একটি জরুরি জিজ্ঞাসা। বাঙলা কবিতা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিরিশের দশকে যে-আধুনিকতা প্রস্তাবিত হয়েছিলো, তার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে নিশ্চয়ই আজ অনেক প্রশ্ন। এর কয়েকটা কারণ : (১) বুদ্ধদেব বসুরা পোয়েট্রি, ক্রাইটেরিয়ন, এনকাউন্টার ইত্যাদি পত্রিকা পড়ে যে-আধুনিকতার পুনরাবৃত্তি করেছিলেন, বাঙালির সামাজিক কিংবা নান্দনিক বাস্তবতা তার থেকে ভিন্ন ছিলো, (২) আমরা এখানে বুদ্ধদেবদের আধুনিকতার পুনরুচ্চারণ করছি অথচ আমাদের সমাজ, লেখক ও পাঠকদের বাস্তবতা সম্পূর্ণ আলাদা, (৩) বুদ্ধদেবদের আধুনিকতা ভাবনার উৎস ছিলো এলিয়ট-পাউন্ড-ইয়েট্স্— এক কথায় অ্যাংলোস্যাকসন ট্রাডিশন; আজকের পৃথিবীতে এই অ্যাংলোস্যাকসন ট্রাডিশনের আধুনিকতা ধারণা পরিত্যক্ত হয়েছে— তার স্থানে সৃষ্টি হয়ে চলেছে কেন্দ্রচ্যুত কাউন্টার-ডিসকোর্সের আধুনিকতা। এই রকম পর্বে এসে আমাদের আধুনিকতার পুনর্ভাবনার প্রয়োজন আছে কিনা, বললে খুশি হবো।

হুমায়ুন আজাদ : প্রশ্ন উঠতে পারে সব কিছু সম্পর্কেই, ওঠা ভালো, তবে মনে রাখতে হবে তা যেনো নির্বোধ প্রশ্ন না হয়। তিরিশি আধুনিকতা সম্পর্কে যে-সব প্রশ্ন ওঠে, তার বড়ো অংশই নির্বোধ কূপমণ্ডূকতা, যা পুরোপুরি হাস্যকর। তিরিশি পাঁচজন যে-কবিতা সৃষ্টি করে গেছেন, তার তুলনা হয় না; তাঁদের কবিতা মিলিতভাবে রবীন্দ্রনাথের কবিতার থেকে মূল্যবান। তাঁরা আধুনিকতা বলতে কী বুঝতেন, তা বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা হচ্ছে তাঁরা কী সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা আধুনিকতা বলতে যা বুঝতেন, তা গ্রহণযোগ্য কি গ্রহণযোগ্য নয়, সেটা ভিন্ন

ব্যাপার; মূল ব্যাপার হচ্ছে আধুনিকতা নেই; যদি কিছু থাকে তবে তা আধুনিকতা নয়, তা অন্য কিছু। পরবর্তীরা তা গ্রহণ করতে পারেন, নাও পারেন, পরবর্তীরা নিজেদের জন্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারেন; কিন্তু আধুনিকতা হচ্ছে ওই বস্তু, যা তিরিশিরা পশ্চিম থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। এখানে যে-তিনটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো বিচার করে দেখতে পারি। (১) প্রথম যে-কারণটি দেখানো হয়েছে— 'বুদ্ধদেব বসুরা পোয়েট্রি, ক্রাইটেরিয়ন, এনকাউন্টার ইত্যাদি পত্রিকা পড়ে যে-আধুনিকতার পুনরাবৃত্তি করেছিলেন, বাঙালির সামাজিক কিংবা নান্দনিক বাস্তবতা তার থেকে ভিন্ন ছিলো', এটা সত্য, তবে এটা পরিচয় দিচ্ছে শিল্পকলাবোধহীনতার। বাঙালির 'সামাজিক বা নান্দনিক বাস্তবতা' অনুসারে মঙ্গলকাব্য বা পুঁথি বা পল্লীগীতি লেখার বেশি কিছু সম্ভব নয়। জীবনানন্দ যদি গুটিকয় চণ্ডীমঙ্গল লিখতেন, আর আমি যদি হামদ-নাত পল্লীগীতি লিখি, তাহলে কি সুখী হবে বাঙালির সামাজিক আর নান্দনিক বাস্তবতা? আমরা চিন্তা ও সংবেদনশীলতার এলাকায়ই পশ্চিমকে আজকাল এড়াতে চাই, এটা পতনের লক্ষণ। চিন্তা ও সংবেদনশীলতা বিশ্বজনীন, তা বিশ্বের যে-কোনো প্রান্তে দেখা দিতে পারে, ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে পারে। কেউ কি বলবে যে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতত্ত্ব এখানে চলবে না, বা চলবে না ফ্রয়েডীয় অবচেতনা, কেননা তা বাঙালির সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা থেকে ভিন্ন? বিদ্যুৎ, বিমান, মোটরগাড়ি, ফ্রিজ, টেলিভিশন, কম্পিউটার, মেশিনগান, রাডার, এমনকি গুঁড়োদুধ কি বাঙালির সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ? মধুসূদনের মেঘনাদবধ বা সনেট বা নাটক কি সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলো বাঙালির সামাজিক-নান্দনিক বাস্তবতার সাথে, আর রবীন্দ্রনাথের কবিতা, যা পশ্চিমি রোম্যান্টিকতার বিলম্বিত প্রকাশ, তাকি বাঙালির সামাজিক-নান্দনিক বাস্তবতার সাথে অভিন্ন? বুদ্ধদেব বসু ও অন্যরা যে-আধুনিক সংবেদনশীলতা নিয়ে এসেছিলেন, এজন্যে তাঁদের পড়েছিলেন, পড়তে পেরেছিলেন এটা বাঙালির জাতিগত ভাগ্য; খুব কি ভালো হতো যদি তাঁরা প্রাণ ভরে বসুমতী, প্রবাসী, আর মাসিক মোহাম্মদী পড়তেন? (২) ষাটের দশকের পর বাঙলা ভাষা-অঞ্চল থেকে আধুনিকতা বিদায় নিয়েছে; এখনকার তরুণেরা আসলে বুদ্ধদেবদের আধুনিকতা পুনরুচ্চারণ করছেন না, তাঁরা আবার অনাধুনিক হয়ে পড়েছেন। আধুনিকতা বলতে আমরা অস্পষ্টভাবে যে-সংবেদনশীলতাকে বুঝি, তা যে চিরকাল চলবে এমন নয়; কোনো কিছুই চিরকাল চলে না, কিন্তু তা যা সৃষ্টি করে যায়, তার যদি আন্তর মূল্য থাকে তবে তা টেকে, যেমন তিরিশি আধুনিক কবিতা। আমাদের 'সমাজ, লেখক, পাঠকদের বাস্তবতার' দোহাই দিয়ে আমরা পারি শুধু পেছনে পড়ে থাকতে। তিরিশিরা যখন আধুনিক কবিতা সৃষ্টি করছিলেন, তখনও একদল কবি ছিলেন যাঁরা আমাদের 'সমাজ, লেখক, পাঠকদের বাস্তবতার সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিন্ন ছিলেন, কালিদাস রায়

বা বন্দে আলী মিয়ারা ছিলেন, কিন্তু তাঁদের লেখা কি লেখা? প্রতিভাবান লেখক কখনো পাঠকের বা তাঁর সমাজের বাস্তবতায় বাস করেন না, বিনোদনকারীরাই থাকেন ওই বাস্তবতায়; প্রতিভাবান লেখা তুচ্ছ বাস্তবতা ও প্রথাগত শিল্পকলাকে রূপান্তরিত করে দেন। (৩) বুদ্ধদেব ও অন্যরা পশ্চিমি আধুনিক চেতনা নিয়ে এসেছিলেন বাংলায়, তাকে শুধু অ্যাংলোস্যাকসন বলা ঠিক নয়, তাকে ইউরোমার্কিন বলাই ভালো; সে-সময় বাংলার কবির জন্যে ওই ছিলো শ্রেষ্ঠ কাজ। এখন ওই ধারণা যে পরিত্যক্ত হয়েছে, তা নয়; এখন কাজ চলছে তার প্রতিক্রিয়ায়। আধুনিক সংবেদনশীলতা, উনিশশতকের মাঝভাগ থেকে যার উন্মেষ ঘটতে থাকে ইউরোপে, এবং বিশশতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে যার চরম বিকাশ ঘটে, যা ছড়িয়ে পড়ে সারা পৃথিবীতে, তা তার অসামান্য দায়িত্ব সম্পন্ন করে গেছে। আমি মনে করি না যে তা চিরস্থায়ী হবে, পৃথিবীতে আর কোনো আন্দোলন বা সংবেদনশীলতা দেখা দেবে না; নিশ্চয়ই নতুন সংবেদনশীলতা দেখা দেবে, কেননা মানুষ সৃষ্টিশীল। ইউরোকেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে যে-প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে, তাও চমৎকার; কিন্তু তা যেনো কূপমণ্ডূকবৃত্তি না হয়ে ওঠে। আমাদের জন্যে এটা হবে খুবই মারাত্মক; এখানে অন্ধকার অত্যন্ত বেশি। আমাদের এখানে শক্তিশালী দুষ্টরা নিজেদের স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটলেই ইউরোপ আমেরিকার নিন্দা করে, যদিও দু-হাতে সুবিধাগুলো লুট করে। শুনতে পাই মাঝেমাঝেই বদমাশরা চিৎকার করছে যে মার্কিনইউরোপি গণতন্ত্র আমাদের এখানে খাপ খায় না, বাকস্বাধীনতা খাপ খায়

না, ব্যক্তিস্বাধীনতা খাপ খায় না; অর্থাৎ যা কিছু ভালো, তাই খাপ খায় না আমাদের সামাজিক-নান্দনিক বাস্তবতার সাথে। এটা হচ্ছে মানুষ ও শিল্পকলার বিরুদ্ধে সুবিধাবাদী বদমাশদের চক্রান্ত। সৃষ্টিশীলতার চিরস্থায়ী কেন্দ্র ব'লে কিছু নেই, কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে যুগে যুগে কিছু কেন্দ্রের উদ্ভব ঘটেছে; ইউরোপ ওই কেন্দ্রের ভূমিকা পালন করেছে অনেক শতক, এখন কেন্দ্র সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে ব'লেই আশা করি। তা সম্পন্ন করতে হবে মেধাপ্রতিভা দিয়ে, অন্ধ কূপমণ্ডূকতা দিয়ে নয়; মার্কিনইউরোপি প্রতিভাকে বর্জন করলেই আমরা কেন্দ্র হয়ে উঠবো না। আমি ভয় পাই এজন্যে যে মেধাপ্রতিভার বদলে বাঙলায় কূপমণ্ডূকবৃত্তিই প্রবল হয়ে উঠছে।

কিছুধ্বনি: কবিতাপত্র
নভেম্বর ১৯৯৩

শুদ্ধতম লেখক হুমায়ুন আজাদ

হুমায়ুন আজাদকে একজন সব্যসাচী শুদ্ধতম লেখক বললে নিশ্চয়ই অত্যুক্তি হবে না। ইতিমধ্যে প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, কলাম, নারীবিষয়ক রচনা এবং প্রবচন লেখার পাশাপাশি একজন সফল ঔপন্যাসিক হিশেবে তাঁর স্থানটি চিহ্নিত হয়ে গেছে। তিনি বাঙলা ভাষার গতানুগতিক ফর্মকে ভেঙে ভাষাশৈলী এবং রচনারীতির ক্ষেত্রে এক অভিনবত্ব এনেছেন। তাঁর উপন্যাসে গল্প বলার স্টাইল সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং অভিনব যাতে তাকে খুব সহজেই অন্যান্য লেখকদের থেকে পৃথক করা যায়। বিনোদনধর্মী চটুল উপন্যাস ছাড়াও যে সিরিয়াস উপন্যাস জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠতে পারে এবারের বইমেলায় প্রকাশিত তাঁর ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল বড়ো প্রমাণ। অল্প ক-দিনের মধ্যেই বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ বেরিয়েছে। বাঙলা উপন্যাসের যে প্রথাগত ধারা সেই ধারার মর্মমূলে প্রথমে আঘাত হানলেন ঔপন্যাসিক হুমায়ুন আজাদ। তাই এবারের বইমেলায় তাঁর উপন্যাস ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইলকে নিয়ে পাঠকের এতো আগ্রহ। গেলো বছরগুলোতে হুমায়ুন আজাদকে কেবল মেলার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে ঘুরে বেড়াতে দেখা যেতো ধীর পায়ে। এবার তিনি প্রতিদিন বিকেলেই আগামী প্রকাশনীর স্টলে বসেন— তাঁর বইয়ের পাঠকদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন, অটোগ্রাফ দেন। কখনো নিজের বইয়ে, কখনো বা অন্য লেখকের বইয়ে। তবে সাহিত্যে যে-ধরনের বই অপাংক্তেয় তিনি সেই সব বইয়ে অটোগ্রাফ দেন না। বুধবার বিকেলে তাঁর সঙ্গে কথা হয় 'আগামী প্রকাশনী'র স্টলে। আলাপকালে উঠে আসে বই, লেখক এবং বইমেলার নানা দিক।

কাগজ : এবারের মেলাতে এই প্রথম আপনি একটা নির্দিষ্ট স্টলে বসলেন এবং বসার ফলে আপনার বইয়ের পাঠকদের সঙ্গে আপনার সরাসরি যোগাযোগ হলো— এ সম্পর্কে আপনার ভেতরে যে অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছে তা বলবেন কি?

হুমায়ুন আজাদ : আমি বইমেলায় অনেক বছর অনেক ঘণ্টা ধরে হেঁটেছি, হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়েছি। গত বছরই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এ-বছর বইমেলায় আমি আর হাঁটবো না, কোনো একটি স্টলে বসবো, সে-অনুসারেই আমি বসছি। পাঠকের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ অবশ্যই হচ্ছে। তাঁরা আমার স্বাক্ষর সংগ্রহ করছেন; আমি অবশ্য আগেও প্রচুর স্বাক্ষর দিয়েছি, তবে কোনো দোকানে বসে

নয়। পাঠকেরা আমার বই কিনছেন স্বাক্ষর সংগ্রহ করছেন, আমার বই প্রচুর বিক্রি হচ্ছে— এটা আমার জন্য খুব উল্লাসজনক নয়। আমার বইগুলো জনপ্রিয় ব'লে পাঠকেরা সংগ্রহ করছেন, তা নয়; গুরুত্বপূর্ণ ব'লেই তাঁরা সংগ্রহ করছেন। যাঁরা কিনছেন তাঁরা একথা বলছেন, যাঁরা কিনতে পারছেন না তাঁরাও বলছেন। একটি অভিযোগ বারবার শুনছি যে আমার বইগুলোর দাম অত্যন্ত বেশি।

তুলনামূলকভাবে অন্যান্য লেখকদের বই এতো দামি নয়। আমার বইগুলো সম্ভবত একই সঙ্গে দামি এবং মূল্যবান। আমার বইগুলো আকারেও বড়ো। অবশ্য বইয়ের দাম লেখার গুণ অনুসারে হয় না; সাধারণত কাগজ এবং অন্যান্য ব্যয়ের ওপর ভিত্তি ক'রেই হয়। অথচ এ-অভিযোগ আমি প্রায়ই শুনি যে আমার বইয়ের দাম অত্যন্ত বেশি। অন্যদিকে জনপ্রিয় ধারার বইয়ের দাম খুব কম হয়ে থাকে। অনেক পাঠকই আমি কেনো উপন্যাস লিখলাম জানতে চান। তাঁরা আমার উপন্যাসটির অভিনবত্বে যে মুগ্ধ হয়েছেন, তা আমি বুঝতে পারি।

কাগজ : স্টলে বসে যে আপনি অটোগ্রাফ দিচ্ছেন, কখনো কি এমন ঘটনা ঘটেছে যে পাঠক অন্য লেখকের বই কিনে আপনার কাছে অটোগ্রাফ নিতে এসেছে— এমনটি ঘটে থাকলে তাতে আপনার প্রতিক্রিয়া কেমন হয়েছে?

হুমায়ুন আজাদ : অন্যদের লেখা বই অনেকেই আমার কাছে নিয়ে আসেন; অনেকে টুকরো কাগজও নিয়ে আসেন। আমি তাতে স্বাক্ষর দিই; তবে দু-একটি

ক্ষেত্রে আমি স্বাক্ষর দিই না। যে-বইগুলোকে আমি খুব নোংরা বই বলে মনে করি, যেগুলোর কোনো সাহিত্যমূল্য নেই, নিতান্ত বাজারি জন্য লেখা, সেগুলোতে স্বাক্ষর দিই না।

কাগজ : সাহিত্যমানের কথা যে আপনি বললেন, এবারের মেলায় যেসব বই ভালো বিক্রি হচ্ছে তার মধ্যে আপনার উপন্যাস ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল ছাড়া অন্যগুলোর তো কোনো সাহিত্য মূল্য নেই— তারপরেও পাঠক কেনো লুফে নিচ্ছে?

হুমায়ুন আজাদ : জনপ্রিয় ধারার বিনোদনমূলক উপন্যাসের চরিত্র কী, এগুলো পাঠক কেনো কেনে; এটা আমি বিভিন্ন লেখায় কয়েক বছর ধ'রে ব্যাখ্যা করেছি। জনপ্রিয় ধারার এ-উপন্যাসগুলো চলার একটি কারণ— মোটামুটিভাবে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীর কিশোরকিশোরী তরুণতরুণীদের লক্ষ্য ক'রে এসব বইয়ের বিষয়বস্তু আর ভাষারীতি ঠিক করা হয়; আমাদের দেশে এ-শ্রেণীর পাঠকের সংখ্যাই বেশি। আমি চাই না আমার উপন্যাসটি নবম শ্রেণীর বালকবালিকারা এসে কিনুক বা পড়ুক। তাদের জন্যে এটি কঠিন বই হবে। আমার বই সাধারণত নবমদশম শ্রেণীর বালকবালিকারা কিনতেও বেশ বিব্রতবোধ করে।

উৎকৃষ্ট সাহিত্য, গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য, চিন্তামূলক বই যারা কিনতে পারতো তারা কেনে না। আমাদের সমাজ যারা চালায় সে-রাজনীতিক সম্প্রদায়-মন্ত্রী, আমলা, ছাড়া কোনো আমলা, কোনো জেনারেল, কোনো মন্ত্রী বই কেনে না। তারা মেলায় আসে না। বই বেশি কেনে মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর তরুণতরুণীরা; আর বিনোদনমূলক সস্তা উপন্যাসগুলো তাদের লক্ষ্য ক'রেই লেখা হয়ে থাকে। বিনোদনমূলক লেখকদের নাম টেলিভিশন নাটকের মধ্য দিয়ে এ-সমস্ত পাঠকরা জানে। তাই তারা তাঁদের বই কেনে এবং প'ড়ে মজা পায়, অল্প সময়ের মধ্যেই ভুলে যায়। ওই বইগুলোর কোনো সাহিত্যমূল্য নেই। আমাদের দেশের পত্রপত্রিকাগুলো এক্ষেত্রে অত্যন্ত খারাপ ভূমিকা পালন ক'রে থাকে- তারা নিম্নমানের সাহিত্যমূল্যহীন গুরুত্বহীন ব্যবসায়িক পণ্যরাশির প্রচার ব্যাপকভাবে দিয়ে থাকে। তারা বিনোদনমূলক লেখককে সমাজের নায়ক করে তুলছে। এটা সাহিত্যের জন্য, সমাজের জন্য ক্ষতিকর।

কাগজ : এই সমস্ত বিনোদনমূলক লেখা থেকে পাঠককে সিরিয়াস বই পাঠের দিকে আকৃষ্ট করা কি সম্ভব? এর কোনো পথ খোলা আছে কি?

হুমায়ুন আজাদ : যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ বই এখানে লেখা হয় না, সেজন্য পাঠকেরা গুরুত্বপূর্ণ বই পড়তে পারছেন না। তবে কিছু পাঠক আছেন যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ বই পড়তে চান। কিন্তু তাঁরা জেনে গেছেন বাংলাদেশে রুচিশীল, চিন্তাশীল এবং সৃষ্টিশীল বই রচিত হচ্ছে না। তাই তাঁরা বইয়ের প্রতি বিমুখ হয়ে

আছেন। তবে তাঁরা যখন দেখেন কোনো বই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, তখন সে-বই কেনেন। এখানে অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের প্রচারও কম— এখানে বিনোদনমূলক বইয়ের প্রচার হয় সবচেয়ে বেশি। সে-কারণে মননশীল পাঠকের দৃষ্টি ভালো বইয়ের দিকে পড়ছে না। তবে চেষ্টা করলে সিরিয়াস পাঠক তৈরি করা যাবে। আমাদের সমাজ যেহেতু অত্যন্ত দূষিত, অত্যন্ত নষ্ট— আমাদের দেশের যারা বয়স্ক নাগরিক, যারা উচ্চপদে আসীন— মনে করা যাক সচিব, যুগ্মসচিব, উপসচিব- মনে করা যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-সহযোগী অধ্যাপক, মনে করা যাক— ব্রিগেডিয়ার, মেজর জেনারেল বা লেফটেন্যান্ট জেনারেল, মনে করা যাক কোটিপতি ব্যবসায়ী- এরা এতো দুর্নীতিতে লিপ্ত হয়ে আছে যে এরা মননশীলতার, সৃষ্টিশীলতার বাইরে চ'লে গেছে এবং এদের বইয়ের জগতে টেনে আনা অসম্ভব ব্যাপার। এরা টাকা-পয়সা আমদানি-রফতানি কালোবাজারি-দুর্নীতি-ঘুষে ব্যস্ত, ফলে বইয়ের দিকে এদের আকৃষ্ট করা সম্ভব নয়। আমাদের ১২ কোটি মানুষের দেশে মাত্র ৪/৫ হাজার পাঠক রয়েছেন, যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ বই পড়েন। শিক্ষার অভাবের জন্যেও পাঠক রুচির ধরন এমন হয়েছে। আমাদের শিক্ষার হার যদি ৮০% হতো, তবে নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের পাঠকের সংখ্যা ওই অনুপাতে বাড়তো। একটি অশিক্ষিত দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরা নানা রকম অনাচারে— অর্থের পেছনে, ক্ষমতার পেছনে লিপ্ত রয়েছে; তাই দুরূহ ও গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের পাঠক বাড়ানো খুব কঠিন। বাংলাদেশের অবস্থা যে এতো খারাপ তাতে বোঝা যায়, যারা দেশ চালায় তাদের মধ্যে কোনো সৃষ্টিশীলতা নেই, কোনো মননশীলতা নেই। আপনি একজন আমলার সঙ্গে কথা বলুন, একজন ব্যাংকের প্রধানের সঙ্গে কথা বলুন, কিংবা একজন বীমাকর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলুন— ঘেন্না লাগবে, দেখবেন তাদের মগজ কতো নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে— অথচ এরা ছাত্রজীবনে অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলো। এরা কতকগুলো গৎবাঁধা কথা ছাড়া বলতে পারেন না। সাহিত্যসাংস্কৃতিক সংস্থার প্রধানের সঙ্গে কথা বলুন, দেখবেন ওই লোকটির মগজ কতো পচে গেছে। আমাদের সমাজ চালাচ্ছে মগজপচা লোকেরা। তারা মননশীল, সৃষ্টিশীল বইয়ের কথা ভাবেই না। তারা যখন নিজেকে উপভোগ করতে চায় তখন হয়তো তারা ভিডিও দেখে, হয়তো ক্লাবে যায়। তারা সৃষ্টিশীলতার, মননশীলতার সম্পূর্ণ বাইরে। বিনোদনমূলক লেখা প'ড়ে কেউ সিরিয়াস বইয়ের পাঠক হয় না, কেননা ওই সব পড়তে পড়তে তাদের রুচি আর মগজ নষ্ট হয়ে যায়; তখন তারা সিরিয়াস বইয়ের শত্রু হয়ে উঠে।

কাগজ : এই প্রবণতা যদি চলতে থাকে তবে এক সময় সৃষ্টিশীল, মননশীল পাঠকের সংখ্যা তাহলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?

হুমায়ুন আজাদ : যতোই বিনোদনমূলক বইয়ে বাজার ভেসে যাক না কেনো— কিছু সৃষ্টিশীল, মননশীল পাঠক থাকবেই। এদের বেশিরভাগ

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পর্যায়ের ছাত্র। যারা সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে তাদের আমি বই পড়তে দেখি না। এই জন্যই দেশের এমন দুরবস্থা। জাতীয় সংসদের কথাই ধরা যাক। সংসদের ৩৩০ জন সদস্যের মধ্যে ক-জন বই পড়ে? যে দেশের সংসদ সদস্যরা বই পড়ে না, মননশীল চিন্তা গ্রহণ করে না, তারা দেশকে কোথায় নিয়ে যাবে তা আমরা বুঝতে পারি। বাংলাদেশের দুর্দশা এর মধ্যেই স্পষ্ট। আমি একটি জিনিস বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করেছি— গত কয়েক বছর আমার সঙ্গে আমার অনেক পাঠক পত্রালাপ করেছেন— সরাসরি তাঁরা আমার লেখা, বাংলাদেশের লেখা, বিশ্বের লেখা সম্পর্কে আলোচনা করেন। আমি দেখেছি তাঁদের প্রায় সবাই সামাজিকভাবে ব্যর্থ মানুষ। কেউ খুব উঁচু চাকুরি করেন না, গাড়িতে চড়েন না, ভালো পোশাক পরেন না, ভালো খাবার ও ঘুষ খান না; কিন্তু তাঁদের চিন্তাভাবনা দেখে আমি বিস্মিত হই। তাঁরা বই পড়েন। এই ব্যর্থ মানুষরাই মননশীল মানুষ; এঁরাই সিরিয়াস বইয়ের কথা ভাবেন, ভবিষ্যতেও ভাববেন। আমাদের সমাজের সফল মানুষেরা অত্যন্ত বদমাশ; বইয়ের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেই।

কাগজ : চিন্তাশীল বইয়ের কথা যদি বলি সেক্ষেত্রেও পাঠকপ্রিয়তার হেরফের হয়। যেমন আপনার ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল যতোখানি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে বা বিক্রি হয়েছে সেই অর্থে একই সময়ে বের হওয়া সৈয়দ হকের টানটান কিংবা চোখবাজি, সেলিনা হোসেনের টানাপোড়েন কিংবা গায়ত্রী সন্ধ্যা ঐ অর্থে পাঠকপ্রিয়তা পায়নি— এই বইগুলো যে বেরিয়েছে অনেক পাঠক জানেনই না। অথচ ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল— এই খোঁজ সবাই জানে— এর কারণ কি?

হুমায়ুন আজাদ : ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল-এর পাশাপাশি এ-চারটি বইকে কেনো সিরিয়াস বই বলা হলো আমি জানি না, সিরিয়াস কিনা তাও জানি না, এ-বইগুলো আমি পড়ার সুযোগ পাই নি। তবে সেলিনা হোসেনের গায়ত্রী সন্ধ্যার কিছু পাতা আমি পড়েছি। আমার কাছে মনে হয়েছে বিষয়টি ভালো, তবে বিষয়টি তিনি যেভাবে উপস্থাপিত করেছেন, তা অনেকটা বানোয়াট ধরনের হয়েছে।

উপন্যাসটির একটি চরিত্রের নাম পুষ্পিতা, তাঁর সন্তানের নাম প্রতীক। ১৯৪৯ সালের কাহিনী বোধ হয় এটা। ওই সময়ে কোনো বাঙালি মুসলমানের নাম এ-ধরনের ছিলো না। সেলিনা হোসেন যখন আমাদের রাজনীতিক বাস্তবতাগুলো উপস্থাপিত করতে চান তখন তিনি এক ধরনের কল্পবাস্তব তৈরি করেন। ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল কেনো এতো পাঠক আকৃষ্ট করছে তার কারণ আমার পক্ষে পুরোপুরি বলা সম্ভব নয়। উপন্যাসটি আজকের কাগজে যখন বেরোচ্ছিলো তখন বিপুল সাড়া পেয়েছিলাম। আমি নিশ্চিত ছিলাম উপন্যাসটি যখন বই আকারে বেরোবে তখন তাঁরা বইটি সংগ্রহ করবেন। উপন্যাসটির বিষয়বস্তু, ভাষা— সর্বোপরি আমার বলার যে একটি বিশেষ ভঙ্গি আছে, যে-ভঙ্গিতে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ বিপন্নবোধ করে অথচ কিছু মানুষ মনে করে

যে এটিই হচ্ছে উপযুক্ত ভঙ্গি, তাতে পাঠকেরা আকৃষ্ট হয়েছেন। আমি সামরিক অভ্যুত্থানের যে-বর্ণনা দিয়েছি, তা আর কোথাও মিলবে না। বিভিন্ন বইতে মেলে ভীরু মানুষের সামরিক অভ্যুত্থানের বর্ণনা। সেগুলো নিতান্ত বই লেখার জন্য বই লেখা। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি যে-বর্ণনা দিয়েছি, তা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের, এ-বর্ণনার ভাষাও সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাংলাদেশে দীর্ঘকাল ধরে যে-মডেলের উপন্যাস চলছে আমার উপন্যাসটি সে-মডেলকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছে। এর বিষয়, ভাষা, অভিনবত্ব,— আমার রচনারীতি অনেক পাঠক পছন্দ করেন,— তাঁরা বইটি কিনছেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় যারা কর্তৃত্ব করছে তারা আমাকে সহ্য করতে পারে না; কিন্তু তরুণ এবং কিছু বয়স্ক মানুষ আমার লেখা পছন্দ করেন।

কাগজ : এমনওতো হতে পারে যে আপনার লেখালেখির নির্দিষ্ট যে একটা ক্ষেত্র সেই ক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে এসে উপন্যাস লিখেছেন এবং এটি আপনার প্রথম উপন্যাস বলেই পাঠক কৌতূহলী হয়ে কিনছেন?

হুমায়ুন আজাদ : তাও আংশিক সত্য। তবে উপন্যাস কিন্তু আমি আগেও লিখেছি— কিশোরদের জন্য আব্বুকে মনে পড়ে। অবশ্যই এটাও অনেকের লক্ষ্য ছিলো— আমার অনুরাগীরা দেখতে চেয়েছিলেন আমি উপন্যাস লেখায় কতোটা সফল হই; আমার বিরোধীরা খুব গভীর উদ্বেগের সাথে প্রত্যাশা করেছিলেন যে আমি ব্যর্থতার পরিচয় দেবো। তাঁরা হতাশ হয়েছেন।

কাগজ : প্রতি বছরই একুশের পদক দেয়া হয়— এই একুশের পদক যাঁরা পান তাঁরা কতোটা পাবার উপযুক্ত— আপনি কি মনে করেন পদক প্রদানটা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ এবং যোগ্য লোকেরাই বরাবর পেয়ে আসছেন?

হুমায়ুন আজাদ : আমাদের দেশে চিরকালই পদক ও পুরস্কারগুলো-দু-একটি ব্যতিক্রমবাদে— দেয়া হয় অনুগত ব্যক্তিদের। আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্র চিরকালই দালাল সৃষ্টি করতে চায়, দালালদের পুরস্কার দেয়। একুশের পদক এবং স্বাধীনতা পদক নামে যে-দুটি পদক সৃষ্টি হয়েছে, সে-দুটি সৃষ্টি হয়েছে একুশ এবং স্বাধীনতাকে অপমান করার জন্য। শুরু থেকে একুশের পদক ঝুলছে একুশবিরোধীদের গলায়, স্বাধীনতার পদক ঝুলছে স্বাধীনতাবিরোধীদের গলায়। এ-গলাগুলো কেবল পদকের জন্যই বানানো হয়েছিলো। এগুলো পদক নয়; কুকুরের গলায় যেমন ব্যান্ড পরিয়ে দেয়া হয়, পদকের কথা মনে হলে আমার কুকুরের গলার ওই বস্তুটিকে মনে পড়ে। প্রতি বছরই অযোগ্য লোকদের পদক দেয়া হয়— যারা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অযোগ্য, শিক্ষার ক্ষেত্রে অযোগ্য, তারা এসব পাচ্ছে। যে-লোকটি সাজিয়ে ঠিক মতো দশটি বাক্য লিখতে পারে না, সে পাচ্ছে শিক্ষার জন্যে পদক; যাঁদের সাহিত্যের কোনো মূল্য নেই তাঁরা পাচ্ছে সাহিত্যের জন্য পুরস্কার। এ-চরিত্রহীনতা রাষ্ট্রযন্ত্রকে দূষিত করছে, পাশাপাশি দেশকেও দূষিত

করছে, আমাদের মগজকেও দূষিত করছে। একুশের পদক পেয়ে এখন আর গৌরববোধ হয় না। পাকিস্তানকালে আদমজি পুরস্কার ছিলো, সম্মানজনক ছিলো। তখন লেখকদের মর্যাদা দেয়া হতো। আদমজি পুরস্কার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি দৈনিকের পাতায় লেখকের ছবি ছাপা হতো, তাঁর জীবনী ছাপা হতো, তাঁকে লাহোরে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করা হতো। শওকত ওসমান, শামসুর রাহমান ও আরো অনেকে ওখানে গিয়ে গৌরববোধ করেছেন। তাঁদেরকে তখন সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মান দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ হওয়ার পর রাষ্ট্রযন্ত্র কতকগুলো লোককে একটি পদক দেয়, তারপর সামাজিকভাবে কোনো স্বীকৃতি দেয় না। দৈনিক পত্রিকাগুলো তাঁদের ছবি, জীবনী ছাপা তো দূরের কথা— একটি মন্তব্যও ছাপে না। তাই পদক পাওয়ার মধ্যে কোনো গৌরব নেই— এটা বন্ধ ক'রে দেয়াই উচিত। তিনটি সরকারের কথা আমার মনে পড়ছে। এরশাদের সময় পদকের পর পদকে এরশাদের অনুচরদের গলা ভ'রে গেলো, যখন অল্প সময়ের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার এলো— খুব বিস্ময়কর, ওই সরকারেরও কতকগুলো দালাল দেখা পদকে ভ'রে গেলো; বর্তমানে বিএনপি সরকারের অনুচররা পদক পাচ্ছে। এদের গলা পদকে পদকে সুশোভিত হয়ে উঠছে। যারা এক সময় জাতীয় পার্টিতে যোগ দিয়েছিলো কিন্তু পদক পায় নি, তারা এখন তাড়া-তাড়ি বিএনপিতে যোগ দিয়ে পদক পাচ্ছে। এদের গলা পদকে ভ'রে যাক, এটা আমি চাই।

কাগজ : আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন যে মেলার স্টলের বিভিন্ন সাইনবোর্ডে ভুল বানানের হিড়িক পড়েছে অথচ মেলা কর্তৃপক্ষ এদিকে আমল দিচ্ছেন না— শুধরানোর চেষ্টা করছেন না— এ বিষয়টাকে আপনি কি হিশেবে চিহ্নিত করবেন?

হুমায়ুন আজাদ : নিরক্ষর সমাজে বানান ভুল খুবই স্বাভাবিক। বাঙলা একাডেমীর কথাই ধরা যাক- এর ক-জন কর্মকর্তা সমস্ত বাঙলা বানান শুদ্ধভাবে লিখতে পারেন, মহাপরিচালক থেকে শুরু ক'রে? বিশ্ববিদ্যালয়ের ক-জন অধ্যাপক— উপাচার্য থেকে শুরু ক'রে প্রভাষক পর্যন্ত— বাঙলা বানান শুদ্ধ ক'রে লিখতে পারেন? আমাদের পণ্ডিতদের ক-জন, লেখকদের ক-জন বানান শুদ্ধ ক'রে লিখতে পারেন ব'লে দাবি করেন, তাহলে আমি তাকে পুরস্কার দেবো। তাই এসব দোকানে যে ভুল বানানের সাইনবোর্ড ঝুলবে, তা স্বাভাবিক। এজন্য আমি তাদের দোষ দিই না। দোষ দিই সমাজকে— যে-সমাজ অশুদ্ধ, তার বানানও অশুদ্ধ হবে। এর মর্মমূল খুঁজতে হবে কেনো তারা অশুদ্ধ বানান লেখে।

কাগজ : অনেকেই বইমেলায় কলকাতার বইমেলার মতো টিকিট পদ্ধতি চালু করার পক্ষপাতী। আপনি কি মনে করেন টিকিট পদ্ধতি চালু করলে মেলা আরো সুশৃঙ্খল, আরো সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে?

হুমায়ুন আজাদ : আমি বইমেলাকে টিকিট-কাটা মেলা হিসেবে দেখতে চাই না। কলকাতার বইমেলা আমি দেখি নি; সেটা সম্ভবত একটি ব্যবসায়িক মেলা। আমাদের এ-বইমেলা— এর নাম বইমেলা হ'লেও আসলে এটা একুশের উৎসব। কেউ কেউ পুঁজিবাদী প্রস্তাব করতে পারেন যে একুশের শহিদ মিনারে ঢোকার জন্যও টিকিট লাগবে। আমি এসবকে কখনোই টিকিট পদ্ধতির কবলে দেখতে চাই না। এ-মেলা এক চেতনার উৎস, প্রাণচাঞ্চল্যের উৎসব। আমি চাই না বইমেলা টিকিট এবং পুঁজিবাদ দ্বারা আক্রান্ত হোক। তাহলে আর এটা একুশের উৎসব থাকবে না। যারা টাকাপয়সার কথা ভাবছে তারা কিছু মানুষকে আটকে দিতে চাচ্ছে, এতো মানুষ দেখতে তাদের ভালো লাগছে না। তারা সুন্দর সুন্দরভাবে মেলায় ঘুরতে ফিরতে চাচ্ছে। এমন মেলা বঙ্গভবনেই হ'তে পারে। ওই যে ওসমানী উদ্যানের মেলা, সেখানে সব সৌন্দর্যই রয়েছে, শুধু মানুষ নেই। একুশের বইমেলায় আসার মতো আনন্দদায়ক ব্যাপার সারা বাংলাদেশে আর নেই। একে টিকিট পদ্ধতির কবলে ফেললে এটা বইয়ের চিড়িয়াখানা হ'তে পারে, কিন্তু বইমেলা হবে না।

খবরের কাগজ
১৩ বর্ষ ৯ সংখ্যা, ১ মার্চ ১৯৯৪ : ১৭ ফাল্গুন ১৪০০

অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকারে এই দশকের অন্যতম সাহিত্য-ব্যক্তিত্ব হুমায়ুন আজাদ

লেখক-কবি-ভাষাবিজ্ঞানী হুমায়ুন আজাদ সারা দেশে বেশ পরিচিতি লাভ করেছেন। টেলিভিশনের জন্যে নাটক না লিখে দেশজোড়া খ্যাতি পাওয়া দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু দেখা গেলো হুমায়ুন আজাদ ওই দুরূহ পথটি অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রশ্ন হলো কী ক'রে তা সম্ভব হলো। তিনি প্রথম বিদগ্ধজনের দৃষ্টি কাড়েন গত দশকের শেষভাগে কবি নজরুল সম্পর্কে একটি কড়া মন্তব্য ক'রে [এটা যতোটা অপপ্রচার ততোটা সত্য নয়' হুআ]। বিভিন্ন বিষয়ে অপ্রত্যাশিত মন্তব্য ক'রেই তিনি সবচে বেশি আলোচিত হন। এছাড়া নিউজপ্রিন্টের মলাট দেয়া সাপ্তাহিকীতে কলাম লিখেও তিনি দেশব্যাপী মনোযোগ আকর্ষণ করেন। এছাড়া কিছু 'প্রবচন' লিখেছেন তিনি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এবং সেগুলো বিতর্কিত হয়েছে। বস্তুত বিভিন্ন অম্লমধুর মতামত অকপটে প্রকাশ ক'রেই তিনি সর্বাধিক পরিচিতি লাভে সমর্থ হয়েছেন। মন্তব্য প্রকাশে তিনি কতোটা নৈর্ব্যক্তিক ও নির্মোহ হ'তে পারেন তার উদাহরণস্বরূপ আল মাহমুদ সম্পর্কে তাঁর কিছু মন্তব্য তুলে ধরা যায় : 'প্রতিক্রিয়াশীলদেরও একজন কবি দরকার, যদিও মৌলবাদে কবিতা নিষিদ্ধ। ফররুখ এক উচ্চকণ্ঠ মৌলবাদী পদ্যরচয়িতা, রাজাকারদের জাতীয় কবি। আর আল মাহমুদ এখন প্রতিক্রিয়াশীলদের কবি। ফররুখ ও আল মাহমুদের পরিণতি একই, তারা ক্রমশই মধ্যযুগী মৌলবাদী হয়েছেন। তবে ফররুখ সুবিধার জন্যে মৌলবাদী হন নি। আল মাহমুদ কতকগুলো কুৎসিত সুবিধার জন্যে মৌলবাদী হয়েছেন— তাঁর কোনো বিশ্বাসই সত্য নয়। এক সময় তিনি পাড়ার মসজিদ ভেঙে পড়ার শব্দে উল্লাস বোধ করেছেন, আরেক সময় উল্লসিত হয়েছেন এই কথা ভেবে যে চাষিরা সচিবালয় দখল করবে। এখন তিনি জায়নামাজে বসে নারীধর্ষণের স্বপ্নে বিভোর। তাঁর গত দু-দশকের কবিতা অপবিশ্বাসের কপট কবিতা এবং কবিতাই নয়, আল মাহমুদ প্রথাগত জসীম-ফররুখ-জীবনানন্দের মিশ্রণ, তাই প্রথাগতদের কাছে ওই সব কবিতা কখনো কখনো বেশি ভালো লাগতে পারে, কিন্তু তার মূল্য খুবই কম।

কেননা তা চেতনার বিকাশ না ঘটিয়ে চেতনার পুনরাবৃত্তি ঘটায়।' [মাটি, ডিসেম্বর, ১৯৯২]।

দেশের সাহিত্যাঙ্গনের হাতে গোনা দু-চারজনের মধ্যে হুমায়ুন আজাদ অন্যতম সেই ব্যক্তি যিনি তাঁর উপলব্ধি আর মতামত ব্যক্ত করার ব্যাপারে দ্বিধাহীন। তাঁর বিতর্কমূলক মন্তব্য যদিও অনেক ক্ষেত্রে বিশ্লেষণবিহীন বা অতিশায়ন দোষে দুষ্ট। [একথা ঠিক নয় : হুআ] তবু একথা মানতেই হবে যে এই কাপুরুষ ও আপোসকামী দেশে হুমায়ুন আজাদের সাহসের তারিফ না ক'রে পারা যায় না। এই 'প্রথাগত সমাজে' যেখানে পরস্পরের পিঠ চুলকানিই হলো সমালোচনার সংস্কৃতি সেখানে হুমায়ুন আজাদ সেই 'নিঃসঙ্গ শেরপা' যিনি সৈয়দ শামসুল হকের মতো সাহিত্য ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে লিখতে পারেন— 'সৈয়দ হক যাঁর প্রধান প্রেরণা কাম, যিনি নারীকে ভোগ্যপণ্যরূপে ব্যবহারে অক্লান্ত, যিনি আঙুল গোল ক'রে তার ভেতরে আরেক আঙুল ঢুকিয়ে 'জিগ জিগ মালুমে'র গল্প বলেন; তিনি উঠে এসেছেন বাদামতলি থেকে, লিখছেন, 'আমার অসুখ নাই, নির্ভয়ে করেন', যিনি নারীকে যৌনপীড়ন না ক'রে উপন্যাস বা অপন্যাস লিখতে পারেন না, তিনি হাহাকার করেছেন মোল্লার মতো।'

তাঁর মন্তব্য তাঁরই ভাষায় 'নির্মম, নির্মোহ, শ্লেষাত্মক, কিন্তু উপলব্ধিগতভাবে সত্য।' তাই শামসুর রাহমান যখন টেলিভিশনে একটি অভিনেত্রীর সাথে উপস্থিত হলেন তখন হুমায়ুন আজাদ লিখলেন— 'শামসুর রাহমান বোঝেন না কার সাথে পর্দায় আর কার সাথে শয্যায় যেতে হয়।' টেলিভিশনের আলোচনা অনুষ্ঠানে অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, ড. মোঃ মনিরুজ্জামানকে প্রায়শ দেখা যায়। হুমায়ুন আজাদ বলেন, 'বাংলাদেশের প্রধান মূর্খদের চেনার সহজ উপায় কোনো আলোচনা অনুষ্ঠান দেখা। ওই মূর্খমণ্ডলীতে উপস্থাপকটি হচ্ছেন মুর্খ শিরোমণি।' হুমায়ুন আজাদ বেশ কিছু পুরস্কারটুরস্কারও পেয়েছেন। বাংলা একাডেমী পুরস্কার ও শিশু একাডেমী পুরস্কার তন্মধ্যে অন্যতম। পুরস্কার পাওয়া সম্পর্কে তাঁর মতামত হলো, 'পুরস্কার অনেকটা প্রেমের মতো, দু-একবার পাওয়া খুবই দরকার, এর বেশি পাওয়া লাম্পট্য।' গত দু-বছর যাবৎ হুমায়ুন আজাদ কেবল আলোচিত লেখকই নন, নারী বইটির কারণে তিনি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। তিনি নারীবাদী নন [এটাও ভুল মন্তব্য : হুআ] কিন্তু নারী ও নারীত্ব নিয়ে তাঁর এই সুপরিসর গবেষণাগ্রন্থটি একজন লেখকের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। প্রমাণ হয় যে তিনি একজন পরিশ্রমী লেখক। তবে বইটি পাঠের সময় মনে রাখা দরকার যে এটি একটি গবেষণাগ্রন্থ— এর প্রধান অংশই হল পৃথিবীব্যাপী নারীবিষয়ক রচনার পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা।

১৯৯২-এর শেষ ভাগে তাঁর উল্লেখযোগ্য দুটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে দুটি পত্রিকায়। একটি হলো আনওয়ার আহমেদ সম্পাদিত কিছুধ্বনি আর অন্যটি

গোলাম কিবরিয়া সম্পাদিত নন্দিত সাহিত্য মাসিক মাটি। এছাড়াও পত্রিকান্তরে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এরশাদের কাব্যচর্চা সম্পর্কে তাঁর মতামত শোনা গেলো। তিনি প্রস্তাব করেছেন যে 'এরশাদের কবিতা নিয়ে আলোচনা করার চেয়ে মলমূত্র নিয়ে আলোচনা করাই শ্রেয়।' সম্ভবত সব ব্যাপারেই রয়েছে তাঁর স্বভাবী তির্যক দৃষ্টি। মাস ছয় আগে বিদেশি দূতাবাসের [দূতাবাসের, কোন দূতাবাসে? : হুআ] এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে তিনি রফিক আজাদকে বলেছিলেন, 'একটি পত্রিকা কবি হিসেবে আমাকে বাতিল ক'রে দিয়েছে। এজন্যে দুঃখ পেলাম। আরো দুঃখ পেলাম কবি হিসেবে তারা আপনাকেও বাতিল ক'রে দিয়েছে দেখে। আমার কবিতা বাতিল হয়ে গেলে আমার গদ্য রচনাসমূহ থেকে যায়, কিন্তু কবিতা বাতিল হ'লে আপনার কিছুই থাকে না।' স্পষ্ট যে দৃষ্টির তির্যকতা তাঁর রসবোধের সাথে মিলিত হয়ে মজাদার ব্যাপারই দাঁড়ায়।

হুমায়ুন আজাদ গদ্যের পাঠক বেশ পেয়েছেন কিন্তু কবিতার পাঠকদের কাছে তিনি যেতে পারেন নি। কারণ এই হ'তে পারে যে, কবিতার জন্যে যে রোম্যান্টিক মনন থাকা দরকার তা তাঁর যথেষ্ট নেই। তিনি যুক্তিবাদী, বস্তুনিষ্ঠ মানুষ। তাঁর আবেগ হয়তো আছে কিন্তু তা রসময় ব'লে মনে হয় না [কবিতা ও আমার কবিতা সম্পর্কে এটা এক অত্যন্ত স্থূল ধারণা : হুআ]। অবশ্য কবি নিজে হয়তো বলবেন যে তাঁর কবিতা আস্বাদনের উপযুক্ত রুচি এখনো গড়ে ওঠে নি। এই বক্তব্যের আমরা বিরোধিতা করবো না। সব সাহিত্যিকই সমসাময়িক কালে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন না। নব্বই দশক ভাগ্যবান, কেননা পাওয়া গেছে হুমায়ুন আজাদের মতো মেধাবী ও পরিশ্রমী একজন লেখককে, সমাজ ও সাহিত্য উভয় বিষয়েই যিনি গতানুগতিকের বাইরে লিখে থাকেন। তিনি একই সাথে সৎ, প্রাজ্ঞ ও সাহসী। কৌশলী তিনি হয়তো নন, কিন্তু সুবিধাবাদের এই যুগে প্রয়োজন তো তাঁরই মতো ব্যক্তিত্বের যিনি ভান জানেন না, দরকষাকষির বাজারি মনোবৃত্তি যাঁর নেই, আপ্তবাক্যের দাসে যিনি পরিণত হন নি। আজ বললে অতিশয়োক্তির মতো শোনাবে কিন্তু যে ভূমিকা হুমায়ুন আজাদ পালন ক'রে চলেছেন তা যদি তিনি অব্যাহত রাখেন তবে সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন তিনি জাতির বিবেকে পরিণত হবেন।

প্রশ্ন : একটি নতুন শতাব্দীর সম্মুখীন হ'তে যাচ্ছি আমরা, বিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে সমকালীন বাঙলা কবিতার গতিপ্রকৃতি এবং সম্ভাবনা সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?

হুমায়ুন আজাদ : একটি অসামান্য শতাব্দী খুব শোচনীয়ভাবে শেষ হ'তে যাচ্ছে; সারা পৃথিবী আর আমরা এখন শতাব্দী শেষের ক্লান্তিতে ভুগছি। শেষ দশকে এসে আমরা দেখছি বিংশশতাব্দী যে-সম্ভাবনা নিয়ে এসেছিলো, অসাধারণত্ব সৃষ্টি করেছিলো, তার সব কিছু নষ্ট হ'তে যাচ্ছে। এ-শতকে শ্রেষ্ঠ

বাঙলা কবিতা লেখা হয়েছে বিশ, তিরিশের দশকে। বিশের মধ্যভাগে যে-কবিরা দেখা দিয়েছিলেন তাঁদের পাঁচজন বাঙলা কবিতার ইতিহাসে সম্মিলিতভাবে সবচেয়ে অসাধারণ কবিতা লিখেছেন। আমরা আজো তাঁদের সে-ধারাই দূরবর্তীভাবে অনুসরণ করছি। আমার নিজের যে-কাব্যবোধ, তাতে মনে হয় ষাটের দশকের পর সত্তর এবং আশির দশকে কোনো নতুন কবি কোনো স্মরণীয় কবিতা রচনা করেন নি। বর্তমানে বাঙলা কবিতা যা লেখা হচ্ছে তার অধিকাংশই কবিতা ব'লে আমার মনে হয় না। এখন যাঁরা ভালো কবি, তাঁরা সবাই পঞ্চাশ এবং ষাটের দশক থেকে উঠে এসেছেন। বাঙলা কবিতার ভাষা, বাঙালির স্বপ্ন, আবেগ সমস্ত কিছুই দূষিত হয়ে গেছে। আমাদের স্বীকৃত, গৃহীত, কবিরাও নিটোল অমলিন কবিতা লিখতে পারছেন না। তরুণদের কবিতা আমি মাঝেমাঝে পড়ি। তাঁরা নিজেদের কবিতা সম্পর্কে যেসব প্রবন্ধ লেখেন, ভালো কবিতার উদাহরণ হিসেবে যে-সব পংক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন, সে-সব উদ্ধৃতি আমার কাছে শোচনীয় মনে হয়। তাঁরা যে-সব পংক্তিকে চমৎকার, অভিনব ব'লে দাবি করেন, আমি বোধ করি তা কবিতাই হয়ে ওঠে নি।

মানুষ সব সময়ই সম্ভাবনাময়। কোনো একটি জাতি অধঃপতিত হয়েছে ব'লেই যে তার উত্থান ঘটবে না, এমন নয়। বাঙালি এখন অধঃপতনের অতলে রয়েছে। তার সৃষ্টিশীলতাও দূষিত ও অধঃপতিত। কিন্তু আমি আশা করি বাঙালির উত্থান ঘটবে, তার মধ্যে সৃষ্টিশীলতা আবার দেখা দেবে।

বাঙলা কবিতার সম্ভাবনার কথা এটুকুই মনে হয় যে আমাদের মুক্ত হ'তে হবে গত তিন দশকের দূষণ থেকে। আমরা কবিতাকে খুব বেশি বাহ্যিক ক'রে তুলেছি; খুব বেশি জনসভার, রাস্তার ক'রে তুলেছি। আমরা সম্মিলিতভাবে প্রকাশ্যে স্বপ্ন দেখি, সম্মিলিতভাবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলি, প্রকাশ্যে সম্মিলিতভাবে কৃত্রিম ব্যর্থতার কথা বলি। এসব পরিহার করতে হবে; এবং বাঙলা ভাষাকে গত তিন দশকে সামাজিকতা, রাজনীতিকতা এবং বিভিন্ন মতাদর্শ দিয়ে যেভাবে দূষিত করা হয়েছে, তা থেকে মুক্ত ক'রে কবির ব্যক্তিভাষায়, একান্ত আপন ভাষায় পরিণত করতে হবে এবং সে-ভাষায় কবিতা লিখতে হবে। তাহলেই কবিতার নতুন সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।

প্রশ্ন : আপনার কি মনে হয় কবিতা খুব দ্রুত বদলে যাচ্ছে? এই পরিবর্তনে পিছিয়ে পড়ার কোনো কষ্ট অনুভব করেন কি?

হুমায়ুন আজাদ : কবিতা কি খুব দ্রুত বদলে যাচ্ছে? আমার তা মনে হচ্ছে না, আমার তো মনে হয় কবিতা পিছিয়ে পড়ছে। যা কিছু পরবর্তীরা সৃষ্টি করেন বা লেখেন, তা অব্যশই ভিন্ন হবে; কিন্তু তা যে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হবেই এমন মনে করার কারণ নেই। মধুসূদন দত্তের পর অত্যন্ত গৌণরা বা অকবিরা ভিন্ন ধরনের কবিতা লিখেছেন, যা কবিতাই হয় নি। কাজেই বদলে যাওয়াই উৎকর্ষ নয়।

বাংলাদেশে বিশেষ বদল কিছুই ঘটে নি। আমার পিছিয়ে পড়ার প্রশ্নই ওঠে না, আমার পরবর্তীরা আমার থেকে অনেক পিছিয়ে আছেন। তাঁদের যে-লেখাপড়া, স্বপ্ন, চিন্তা আর প্রতিভা, তা অনেক প্রাচীন, অনেক পূর্ববর্তী। তাঁরাই বরং আমার অশিক্ষিত পূর্বপুরুষ হতে পারতেন।

প্রশ্ন : কবিতা লেখার ব্যাপারে আপনার সবচেয়ে বড়ো প্রেরণা কী?

হুমায়ুন আজাদ : আমি প্রেরণায় বিশ্বাস করি না। রোম্যান্টিক কবিদের প্রধান বিশ্বাস ছিলো প্রেরণায়। তাঁরা অনুপ্রাণিত মুহূর্তে অনুপ্রাণিত প্রবল ঝর্ণাধারার মতো কবিতার উৎসারণ ঘটাতেন। আমি কোনো কোনো কবিতা সারা মাস ধরে লিখি। অথবা দিনের পর দিন আমার মনের মধ্যে আবেগ জন্ম নেয়, তা সৌন্দর্যের আকার পায়, এক সময়ে প্রকাশিত হয়। কাজেই প্রথাগতভাবে যাকে প্রেরণা বলে, তা আমার লেখার মধ্যে নেই। আমি লিখি, কারণ আমার মনের মধ্যে স্বপ্ন এবং সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়, যাকে আমি ভাষায় রূপায়িত করে থাকি। অবশ্য আমার সব রচনাই, বলা যেতে পারে, মানুষের অনন্ত সৃষ্টিশীলতার খণ্ড প্রকাশ।

প্রশ্ন : শিল্পসমালোচকদের ভূমিকা অনেক। আমাদের দেশে আজকের শিল্পসমালোচকদের দৃষ্টিভঙ্গি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই খুব স্থূল। ফলে শিল্পী যে গড়ে উঠবে তার যোগ্য পরিবেশ তৈরি হচ্ছে না। এ্যাপ্রেসিয়েশন বলে একটা কথা আছে। আপনি এর কতোটা অভাব অনুভব করছেন?

হুমায়ুন আজাদ : জাতিগতভাবে আমাদের সাংস্কৃতিক মান অত্যন্ত নিম্ন। আমরা উৎকর্ষ এবং অপকর্ষের মধ্যে সাধারণভাবেই পার্থক্য করতে পারি না। বাঙলায় সাহিত্য বা শিল্পকলা মূল্যায়নের যে-ধারা রয়েছে তার মান উন্নত নয়। বাঙলা সাহিত্যে অনেক অধ্যাপকধর্মী সাহিত্য ও শিল্পসমালোচক রয়েছেন, তাঁদের লেখা ছাত্রদের উপকারে আসে, কিন্তু প্রকৃত সমালোচকের সংখ্যা খুবই কম। বাংলাদেশে সমালোচনার ধারাই গড়ে ওঠে নি। এখানে স্থূল জনরুচি দিয়েই শিল্পের মান নির্ণীত হয়ে থাকে। গুরুত্বপূর্ণ সমালোচকের মূল্যায়ন এখানে গৃহীত হয় না, বরং যারা জনরুচির পক্ষে, যারা জনরুচিকে, নিম্নমানের সৃষ্টিকে প্রশংসা করে, আত্মরক্ষার জন্যে প্রশংসা করে, তাদের কথাই বেশি গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এখন যে-পরিস্থিতি চলছে সেখানে কোনো মানদণ্ডই কার্যকর নয়। এখন নিকৃষ্ট উৎকৃষ্টের মর্যাদা পাচ্ছে, উৎকৃষ্ট কোনো মূল্য পাচ্ছে না। আমাদের সমাজ যেহেতু জাতিগতভাবে পরশ্রীকাতর সেজন্যে প্রতিভাবানকে প্রথম স্বীকার করে না, মূল্য দেয় না, তাকে নানাভাবে পর্যুদস্ত করতে চায়। প্রতিভাহীনেরা এখানে সহজে স্বীকৃতি পেয়ে থাকে। আমাদের প্রচার মাধ্যমগুলো সম্পূর্ণভাবে নিকৃষ্ট ব্যক্তি এবং বস্তুর প্রচারে নিয়োজিত রয়েছে। যা মূল্যবান তা জাতিগতভাবে অস্বীকৃত, সরকারিভাবে তো বটেই।

প্রশ্ন : 'নারীবাদী' শব্দটিকে অনেক বিদগ্ধজনও শ্লেষের সাথে উচ্চারণ করেন, আপনি কি মনে করেন এক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকার অসামঞ্জস্যতা দায়ী? তাঁরা নিজেদেরকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারছেন না?

হুমায়ুন আজাদ : এখানে বিদগ্ধজন বলে যাঁদের চিহ্নিত করা হয় তাঁরা আসলে বিদগ্ধ নন; তবে নারীদের বিপক্ষে অধিকাংশ মানুষ বা পুরুষ রয়েছে। নারীবাদ সম্পর্কে অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা এখানে প্রচলিত। এজন্যে উগ্র পুরুষতান্ত্রিকরাও নারীবাদের বিরুদ্ধে, আর এখানে নারীমুক্তিবাদী কিছু সংঘ রয়েছে, তারাও 'নারীবাদ' শব্দটিকে সহ্য করতে চান না। যে বিদগ্ধজনদের কথা বললেন, তাঁরা নারীবাদ ব্যাপারটি বোঝেন না। তাঁরা মনে করেন নারীর মুক্তি ঘটলে তাঁরা এখন যে-আধিপত্য বিস্তার করে আছেন, সে-আধিপত্য ক্ষুণ্ন হবে, তাই সচেতন এবং অবচেতন ভয় থেকে তাঁরা শ্লেষ করে থাকেন। চিরকালই একটি আধিপত্যশীল শ্রেণী যখন বিপন্ন হয়ে ওঠে তখন নতুন শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করে, তার নিন্দা করে, উপহাস করে, তার নামে নানা অপবাদ দেয়। এটা হচ্ছে আত্মরক্ষার শেষ ভোঁতা অস্ত্র। তাই ওই বিদগ্ধ ব্যক্তিরা আসলে বিপন্ন ব্যক্তি।

প্রশ্ন : আপনার কি মনে হয় না এ ক্ষেত্রে নারীবাদীরাও যথাযথ ভূমিকায় ঠিক সেই অর্থে আবির্ভূত হতে পারছেন না?

হুমায়ুন আজাদ : এখানে কিছু নারীসংঘ রয়েছে তাঁরাও 'নারীবাদী' শব্দটিতে বিব্রতবোধ করেন। কিছু নারীমুক্তিবাদী সাক্ষাৎকারে বলেন, আমি নারীবাদী নই, মানবতাবাদী। এদের জন্যে করুণা হয়। তাঁরা আসলে স্ত্রীবাদী। নারীমুক্তি বলতে তাঁরা স্ত্রীর সুযোগসুবিধা বোঝেন। তাঁরা যে দাবি জানান তা স্বামীদের কাছে স্ত্রীদের দাবি। তাঁরা চান স্বামীরা তাঁদের সাথে আরেকটু ভালো ব্যবহার করবে, শাড়ি লিপস্টিক গয়না আরও বেশি সরবরাহ করবে, স্বামী যদি আবার বিয়ে করে, তাহলে তাদের তালাক দেবে না। তাঁরা আসলে নারীমুক্তিবাদী নন। তাঁরা স্ত্রীবাদী। তাঁরাও এক ধরনের পরগাছা। নারীবাদের মূল কথা হচ্ছে নারী ও পুরুষ সমস্ত ক্ষেত্রে সমান, কেউ কারো অধীন নয়, নারীপুরুষের অধিকার সমান। এখানে নারীবাদী আন্দোলনই গড়ে ওঠে নি। পশ্চিমে নারীবাদী তাত্ত্বিকেরা অসামান্য সব বই লিখেছেন, যা গত তিরিশ বছরে পশ্চিমের পুরুষেরাও লিখে উঠতে পারেন নি। তারা একে একটি তাত্ত্বিক কাঠামো দিয়েছেন; এবং গত পাঁচ হাজার বছরের পুরুষ এবং পিতৃতান্ত্রিক সভ্যতার অত্যাচার, শোষণের চরিত্র উদঘাটন করেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন নারীর মুক্তি অবধারিত। আমাদের এখানে কোনো তাত্ত্বিক কাঠামো পেশ করা হয় নি। আমরা অত্যন্ত উগ্র মধ্যযুগীয় পুরুষতন্ত্রের মধ্যে বাস করি, ফলে নারীবাদ সম্পর্কে এখানে কোনো সুষ্ঠু ধারণারই বিস্তার ঘটে নি।

প্রশ্ন : নারী গ্রন্থটি সম্পর্কে কিছু বলুন, এর উৎস, বিষয়বস্তু, প্রেক্ষাপট...।

হুমায়ুন আজাদ : নারী বইটি নারীকে বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে গত পাঁচ হাজার বছরের পিতৃতান্ত্রিক সভ্যতার বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ। গত পাঁচ হাজার বছর ধরে যে-সমস্ত প্রথা, নিয়ম, শৃঙ্খলা চলছে, তার কিছুই আর চলতে পারে না। এ-ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন দরকার। গত পাঁচ হাজার বছর ধরে সবচেয়ে উৎপীড়িত পর্যুদস্ত শ্রেণীটি বা প্রজাতিটি হচ্ছে নারী। নারীকে শোষণপীড়ন করার জন্যে সারা পৃথিবী জুড়ে অজস্র বিধিবিধান তৈরি করা হয়েছে। সমাজের প্রতিটি অণুপরমাণু নারীর বিরুদ্ধে কাজ করে। পৃথিবীই হচ্ছে নারীর বিরুদ্ধে কর্মরত একটি উগ্র পুলিশ বাহিনী। আমি মানুষের সম্পূর্ণ মুক্তি চাই, কোনো প্রথায় বিশ্বাস করি না, সমস্ত প্রথাই আমার কাছে শেকলমাত্র, তাতে আমি বন্দি। আমার চেয়েও বেশি বন্দি নারীরা, আমি তাদের মুক্তি চাই। তাই নারী লিখেছি; ভেতরে ভেতরে নিজেকেও মুক্ত করতে চেয়েছি বলেও এ-বইটি লিখেছি।

প্রশ্ন : বর্তমান সময়ে পত্রপত্রিকায় বেশ 'কলাম' লেখার জোয়ার লক্ষ করা যাচ্ছে। যাঁরা কোনো দিন এক অক্ষরও লেখেন নি তাঁরাও কলাম লিখছেন। একজন অনেকাংশে জনপ্রিয় এবং প্রাজ্ঞ কলাম লেখক হিসেবে আপনি কলামের এই ব্যাপক প্রাবল্যকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখছেন?

হুমায়ুন আজাদ : বাংলাদেশে-যে কলামবিস্ফোরণ ঘটেছে সেটা আমাদের রাজনীতিক প্রক্রিয়ার এক অবধারিত পরিণতি। প্রচুর পত্রপত্রিকা বেরুচ্ছে এখন, সেগুলো ভরার জন্যে কলাম অত্যন্ত দরকারি হয়ে পড়েছে। সমস্যা হচ্ছে সুষ্ঠু চিন্তা করতে পারেন এবং সে-চিন্তাকে শুদ্ধ গদ্যে প্রকাশ করতে পারেন এমন লেখকের সংখ্যা অত্যন্ত কম বাংলাদেশে। কলামের নামে সাধারণত ব্যক্তিগত কিছু তুচ্ছ অভিজ্ঞতা এবং মতামত ছাপা হচ্ছে, যা সাধারণত অপাঠ্য। আমি নিজেও কলাম লিখেছি, কিন্তু আমি অন্যের লেখা কলাম পড়িই না।

প্রশ্ন : একেবারেই পড়েন না? তাহলে আপনি কী করে বুঝলেন তাঁদের লেখা অপাঠ্য?

হুমায়ুন আজাদ : (হেসে) আমি পড়িই না বলার অর্থ হচ্ছে যাঁরা মনোযোগের সঙ্গে কলাম পড়েন, না পড়লে অসুস্থ বোধ করেন, তাঁদের মতো করে পড়ি না। আমি চোখ ফেলেই লেখাটিত কী আছে বুঝতে পারি। আর সবারই দু-একটি রচনা পড়ে বুঝে নিয়েছি তাঁদের চিন্তা আর বাক্যের শক্তি। আমার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রতিটি কলাম পড়ার প্রয়োজন পড়ে না। অনেকটা ক্যামেরার মতো চোখ ফেলেই বুঝতে পারি এর মধ্যে কী বস্তু রয়েছে।

প্রশ্ন : শিল্পের বিভিন্ন মাধ্যমে কাজ করছেন। আপনি নিজেকে মূলত কী মনে করেন? কবি? কলাম লেখক? শিল্প সমালোচক? প্রাবন্ধিক?

হুমায়ুন আজাদ : আমাকে দেখা উচিত সম্পূর্ণরূপে, খণ্ডিতভাবে নয়। সব মিলিয়ে দেখা হলেই ধরা পড়বে আমি কি, আমার কতোটা গুরুত্ব আছে বা নেই। খণ্ডিতভাবে আমাকে দেখলে আমার প্রতি অবিচার করা হবে। আমি মূলত অনেক কিছু।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন : নাসরীন জাহান
বাংলাবাজার ম্যাগাজিন: বুধবার ১৬ পৌষ ১৩৯৯ : ৩০ ডিসেম্বর ১৯৯২

আমার ব্যর্থতা সম্ভবত এই যে আমি সাধারণত ব্যর্থ হই না

লেখকেরা যদি নিজেরাই নিজেদের সাক্ষাৎকার নেন, তাহলে ব্যাপারটি কেমন দাঁড়ায়— এ-চিন্তা থেকে হুমায়ুন আজাদের এ-ভিন্নধর্মী সাক্ষাৎকার। এখানে তিনি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করেছেন [সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীদের প্রবল চাপে, তাঁরাই বিষয়গুলো সরবরাহ করেছেন; হুআ], বিভিন্ন বিষয়ে কখনো কখনো কথা বলেছেন নিজের সাথে। এ-কথোপকথন থেকে বেরিয়ে এসেছেন অন্য এক হুমায়ুন আজাদ।

প্রশ্ন : বাংলাদেশে যারা সাক্ষাৎকার নেয়ার মোটেই উপযুক্ত নয় তারা এতো সাক্ষাৎকার নিচ্ছে কেনো?

উত্তর : প্রচুর সাক্ষাৎকার ছাপা হচ্ছে পত্রপত্রিকায়, —যাদের সাক্ষাৎকার নেয়া হচ্ছে তারা সাক্ষাৎকার দেয়ার উপযুক্ত নয় আর যারা নিচ্ছে তারাও সাক্ষাৎকার নেয়ার উপযুক্ত নয়। সাক্ষাৎকার নেয়ার যোগ্যতা হচ্ছে যাঁর সাক্ষাৎকার নেয়া হচ্ছে তাঁর সম্পর্কে ভালোভাবে খবরটবর রাখা, তিনি বইপত্র লিখে থাকলে সেগুলোর অন্তত কয়েক পাতা আগেই পড়া। আমি বিভিন্ন সাক্ষাৎকারের ওপর চোখ বুলিয়ে দেখি সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী কিছু না জেনেই বড়ো বড়ো ভারী ভারী অর্থাৎ নিরর্থক প্রশ্ন করছে, আর সাক্ষাৎকারদাতাও কিছু না বুঝেই স্তবক ভ'রে উত্তর দিচ্ছেন।

প্রশ্ন : এ-ব্যাপারটি কেনো ঘটছে বাংলাদেশে?

উত্তর : এর মূল কারণ আমাদের সার্বিক অন্তঃসারশূন্যতা। যারা সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন তারা অন্তঃসারশূন্য, যারা নিচ্ছে তারা আরো বেশি অন্তঃসারশূন্য। দুই অন্তঃসারশূন্যতা মিলে তৈরি করছে এক বিপুল অন্তঃসারশূন্যতা, যার নাম বাঙালি, বাংলাদেশ বা সাক্ষাৎকার।

প্রশ্ন : বাঙালি পৃথিবীতে খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ করে নি, তবু তারা এতো অহমিকায় ভোগে কেনো?

উত্তর : আমাদের কোনো আবেগ-চিন্তা-উপলব্ধিই মৌলিক নয়; এমনকি রবীন্দ্রনাথেরও। বাঙালি আধুনিক বিশ্বকে মৌলিক কিছু দেয় নি। তবে

হীনমন্যতাবোধ থেকেই তার অহমিকাবোধের উদ্ভব ঘটেছে। প্রতিটি বাঙালিই নিজেকে কেন্দ্র বলে মনে করে— মনে করে, 'আমি হচ্ছি সৌরজগতের কেন্দ্র।' বাঙালির আচরণেও এটা বোঝা যায়— দু-হাত যেভাবে পকেটে ঢুকিয়ে হাঁটে বা চুলে হাত বুলোয় বা কথা বলে বা অন্যদের উপহাস করে, তাতে তার সন্দেহ থাকে না যে সে সৌরজগতের কেন্দ্র, তাকে ঘিরেই ঘুরছে সব কিছু। প্রতিটি ব্যক্তিই এখানে কেন্দ্র হয়ে উঠেছে, আর এ-অহমিকাই বাঁচিয়ে রাখছে তাদের।

প্রশ্ন : যখন রাস্তা দিয়ে চলি, বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই, তখন বাঙালির মুখের দিকে তাকালেই মনে হয় এরা অত্যন্ত কামক্ষুধার্ত। এদের কামক্ষুধা মেটে নি, মিটবে না। কিন্তু তাদের সাথে কথা বলতে গেলে মনে হয় তাদের মতো নিষ্কাম ব্যক্তি আর নেই। এটা কেনো?

উত্তর : আমি নারী লেখার সময় অনেককে প্রশ্ন করেছি তাদের কামজীবন, কামনাবাসনা সম্পর্কে। দেখেছি তারা জেসাসের মতো নিষ্কাম, যেনো তাদের যৌনাঙ্গ বলে কোনো অঙ্গ নেই। কিন্তু বাঙালি তরুণবৃদ্ধ মেয়েদের দিকে লকলকে চোখে তাকায়— যতো বেশি বয়স ততো বেশি লকলকে দৃষ্টি। কিন্তু প্রশ্ন করলেই তারা নিষ্কাম পরমহংস। বাঙালি কপট, প্রশ্ন করে তার ভেতর থেকে কোনো সত্য বের করা যায় না। কাম বাঙালির সারাক্ষণের ভাবনার বিষয় বলে বাঙালি নিজেকে অপরাধী মনে করে, তাই প্রচুর মিথ্যে কথা বলে সে নিজেকে দেবদূত করে তুলতে চায়।

প্রশ্ন : এটা কি আমাদের বড়ো বড়ো লেখকদের মধ্যেও পাওয়া যাবে? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও কি এমন ভাব ধরেছিলেন?

উত্তর : প্রচুর পাওয়া যাবে, আর রবীন্দ্রনাথ ভ'রেই পাওয়া যাবে। আমাদের বড়ো লেখকেরাও কপটতার বাইরে যেতে পারেন নি। আমরা অত্যন্ত রুদ্ধ সমাজে বাস করি, যেখানে কোনো রকম স্বাধীনতা নেই। এখানে যতো বেশি কপটতা করা যায় ততো বেশি গ্রহণযোগ্য হওয়া যায়। এদেশে সত্যবাদী স্পষ্টভাষী মানুষের থেকে কপট মিথ্যাভাষী মানুষ অনেক বেশি শ্রদ্ধেয়, অনেক বেশি পূজনীয়। তারা মনে করে তারা যদি নিষ্কামতার ভঙ্গি করে তাহলে সমাজের কাছে অনেক বেশি শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠবে। ধর্ষণকারীরাও এখানে নিষ্কাম। ধর্ষণকারীকে যদি প্রশ্ন করা হয় সে কাম পছন্দ করে কি না, দেখা যাবে সে কামকে পাপের থেকেও বেশি ঘৃণা করে।

প্রশ্ন : বাঙালিদের শতকরা প্রায় ৯০ থেকে ৯৫ ভাগ খুব অপরিতৃপ্ত কামজীবনযাপন করে?

উত্তর : আমার এমনই মনে হয়। আমাদের কোনো কিনসে বা মাস্টার্স ও জনসন নেই, তাই ঠিক পরিসংখ্যান জানি না; তবে বাঙালি খুব কামঅতৃপ্ত জাতি। এর কারণ বাঙালির মানসিক গঠন ও তার সামাজিক অবস্থা। একটা সরল উদাহরণ দিই; একটি নারী ও পুরুষ যদি মিলিত হতে চায় তার জন্যে দরকার

নিরুপদ্রব সময় ও একটি নিজস্ব কক্ষ, যা অধিকাংশ বাঙালির নেই। যাদের চমৎকার ফ্ল্যাট আছে তাদেরও নিরুপদ্রব কক্ষ নেই। দেখা যাবে যে নতুন বিয়ে করেছে দুই যুবকযুবতী, রাত বারোটায় তারা শোয়ার সুযোগ পেয়েছে, শোয়ার চেষ্টা করছে, এমন সময় বাবা এসে টোকা দিচ্ছে দরোজায়, তার একটা কথা বলার আছে। আমি দেখেছি নববিবাহিতরাও পরস্পরকে উপভোগ করে অপরাধবোধের সাথে পালিয়ে পালিয়ে। তাদের উপভোগের কাল দু-এক মিনিটের বেশি হয় না। এতে বোঝা যায় কতোটা অপরিতৃপ্ত তারা। আমাদের দেশে বিয়েই হচ্ছে কামের ছাড়পত্র, কিন্তু সেটাও তৃপ্তিকর হয় না।

প্রশ্ন : আমাদের সমাজে অধিকাংশ পুরুষ কি বিবাহপূর্ব যৌনসম্পর্ক স্থাপন করে? কার সাথে?

উত্তর : আমাদের দেশে মনে করা হয় যে নারীপুরুষ কামসৎ থাকবে বিয়ে পর্যন্ত; মেয়েরা সাধারণত থাকে, তবে আমার ধারণা, অধিকাংশ পুরুষই বিবাহপূর্ব কামে অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকে। পতিতাই এদেশে প্রাকবিবাহ কামতৃপ্তির উপায়, এর সুযোগ বা দুর্যোগ অনেকেই নিয়ে থাকে। বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যে সেটি পচে যায়, স্বামী-স্ত্রীর কামজীবন অসুস্থ হয়ে ওঠে। তখন পুরুষ খোঁজে অগার্হস্থ্য কাম। বিবাহবহির্ভূত যৌনসম্পর্কই সবচয়ে সুখকর, সবচেয়ে উত্তেজক এবং সবচেয়ে সৃষ্টিশীল। পাশ্চাত্যে যৌনসম্পর্কের জন্যে বিবাহ ব্যাপারটি সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে গেছে। এখানে বিবাহপূর্ব বা বহির্ভূত কাম নিষিদ্ধ শুধু মেয়েদের বেলা। মেয়েদের সব রকমের বাধা দিয়ে আটকে রাখা হয়, নইলে মেয়েরাও বিবাহপূর্ব ও বহির্ভূত যৌনসম্পর্কে আগ্রহী। সামাজিক চাপে মেয়েরা এগোয় না, তবে একেবারেই যে এগোয় না এমন নয়।

প্রশ্ন : মদ্যপান?

উত্তর : মদের ব্যাপারেও একথা সত্য। এদেশের সবাই কমবেশি মদ্যপান করতে চায়, কিন্তু বলতে চায় না; আর যারা করে তারাও স্বীকার করে না। আমি কিছু নারীকে জানি যারা দূতাবাসে আর উৎসবে গিয়ে প্রচুর মদ্যপান করে, ফিরে এসে বলে তারা শুধু কোক খেয়েছে।

জ ন প্রি য় তা

প্রশ্ন : আমি কি জনপ্রিয়?

উত্তর : না, আমি জনপ্রিয় নই। চিত্তবিনোদনকারীরাই সাধারণত জনপ্রিয় হয়ে থাকে, আমি তা নই; আমি চিত্তবিনোদন করি না, বরং অনেকের চিত্তজর্জর করে থাকি। সিনেমার অভিনেতা, রাজনীতিক, আর বিনোদনমূলক সস্তা বইপত্র উৎপাদনকারীরাই সাধারণত জনপ্রিয় হয়ে থাকে। আমার দু-একটি বই বেশি বিক্রি হয়েছে, কিন্তু আমি জনপ্রিয় নই। আমার বই বেরোলেই কিছু পাঠক অন্ধের মতো কেনে না, আমার বই পড়ার জন্যে পাগল হয়ে থাকে না। আমার বইয়ের

পাঠক হওয়ার জন্যে কিছুটা মগজ দরকার; আর জনপ্রিয় লেখক সাধারণত তারাই হয়, যাদের লেখা পড়ার জন্যে মগজের দরকার পড়ে না। প্রকৃত শিল্প যারা সৃষ্টি করে তারা কখনোই জনপ্রিয় হয় না। রবীন্দ্রনাথ গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন আর আছেন, তিনি কখনো জনপ্রিয় ছিলেন না। পৃথিবীর সব দেশেই কিছু লেখক থাকে যাদের কাজ মগজহীন পাঠকদের তৃপ্ত করা, আমাদের দেশেও রয়েছে। তাদের কেউ রগরগে, কেউ ভাবালুতাপূর্ণ, কেউ মজাদার লেখা লেখে, যেগুলোর কোনো সাহিত্যমূল্য নেই। আমাদের সাংস্কৃতিক মান নিম্ন, সেজন্য জনপ্রিয় লেখকদের ভালো লেখক, এমনকি শ্রেষ্ঠ লেখকও মনে করা হয়। বাঙলা সাহিত্যের বিকাশের ইতিহাসে জনপ্রিয় লেখকদের কোনো স্থান নেই।

না রী বা দ

প্রশ্ন : নারীবাদী তত্ত্ব এখানে প্রস্তাবিত হতে এতো দীর্ঘ সময় লাগলো কেনো? নারীবাদ কি আমরা বুঝি, আমাদের নারীমুক্তিবাদীরা বোঝেন?

উত্তর : পাশ্চাত্যে নারীবাদ দু-শতাব্দী ধরে চলছে, তার সাথে আমাদের নারীমুক্তিবাদীদের পরিচয় ঘটে নি। নারীবাদ শুধু একটি সামাজিক-রাজনীতিক আন্দোলন নয়, এটা এক মননশীলতার আন্দোলন। আমাদের নারীমুক্তিবাদীরা তা বোঝেন না, বোঝার চেষ্টা করেন নি। তাঁদের লেখাও অত্যন্ত মননশীল, ওগুলো পড়া ও বোঝা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি, তাই ১৯৯২ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে আমাদের।

নারীবাদ আমরা বুঝি না, আমাদের নারীমুক্তিবাদীরাও বোঝে না। নিজেকে নারীবাদী বলে এমন নারী এখানে বেশি পাওয়া যাবে না। একদল নারী আছেন, যাঁরা নারীদের অধিকার চান, কিন্তু নিজেদের নারীবাদী বলেন না; তাঁরা বলেন, আমরা নারীমুক্তি চাই, কিন্তু নারীবাদ বড়োই খারাপ জিনিস। এসব তাঁরা আজেবাজে পুরুষের কাছে শিখেছেন, শিখেছেন যে নারীবাদ খুব খারাপ, নারীবাদ হচ্ছে পরপুরুষের সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপন করা। এমন ভুল আর অপব্যাখ্যা এখানে প্রচলিত যে নারীবাদীরা নিজেদের নারীবাদী বলতে খুবই লজ্জা পান। এতে তাঁদের সতীত্ব নষ্ট হয়। এখানকার নারীমুক্তিবাদীদের আমি বলি স্ত্রীবাদী— তাঁরা চান আরেকটুকু স্বাধীনতা, আরেকটুকু দামি কাপড়চোপড়, লিপস্টিক। তাঁরা চান স্বামী আরেকটা বিয়ে করবে না, করলেও তাদের তালাক দেবে না। এঁরা অনেকে পুরুষের মতোই ব্যবসায়ী-দূতাবাস আর এনজিও থেকে টাকা আনে, চমৎকার থাকে, আর নারীমুক্তির মিছিল করে। আর একটি আছে নোংরা নারীবাদী।

র বী ন্দ্র না থ

প্রশ্ন : রবীন্দ্রনাথের সমালোচকেরা এতো নিম্নমানের কেনো?

উত্তর : বাঙলা সমালোচনা স্বভাবতই খুব নিম্নমানের। রবীন্দ্রনাথের সমালোচক মানে হচ্ছে রবীন্দ্রদেবতার ভক্ত। ভক্তের পক্ষে সমালোচনা অসম্ভব, পূজো করাই তার ধর্ম। রবীন্দ্রনাথের মুখোমুখি ও-ভক্তরা এতো অসহায় বোধ করে যে রবীন্দ্রনাথকে ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ করার বদলে তারা তাঁর পদতলে প্রণাম করে। রবীন্দ্রনাথের সমালোচক হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের পদতলে প্রণত এক অসহায় ব্যক্তি। তারা সমালোচক নয়। পদালোচক।

নী র দ সি চৌ ধু রী

প্রশ্ন : মননশীল এ-লোকটি এতো ভাঁড়ামো কেনো করেন?

উত্তর : বাঙলা সাহিত্যে কয়েকজন ভাঁড় রয়েছেন, যাঁদের প্রতিভা ভাঁড়ামোতে নষ্ট হয়েছে। যেমন, ঈশ্বরগুপ্ত, ভাঁড়ামো করে নষ্ট হয়েছেন। সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর যে-পাণ্ডিত্য ও শিল্পবোধ ছিলো তাতে তিনি আরো ভালো লিখতে পারতেন, কিন্তু তিনিও ভাঁড়ামো করে নষ্ট হয়েছেন। আর নীরদ সি চৌধুরী ভাঁড়ামো করে খ্যাতি পেয়েছেন, তাঁর পক্ষে আর কিছু সম্ভব ছিলো না। তবে তিনি বাঙালিকে একটি উল্লেখযোগ্য বাতিকগ্রস্ত মানুষ উপহার দিয়েছেন।

ব্য র্থ তা

প্রশ্ন : আমার ব্যর্থতা কোথায়?

উত্তর : আমার ব্যর্থতা সম্ভবত এই যে আমি সাধারণত ব্যর্থ হই না। মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় আমি ব্যর্থ হই।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন : আমিনুর রশিদ ও ব্রাত্য রাইসু
বাংলাবাজার পত্রিকা : শুক্রবার ২২ মাঘ ১৪০০ : ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪

বাঙালিকে আমি সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিতে চাই

হুমায়ুন আজাদ যুগপৎ একজন প্রতিভাবান ও খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব। তাঁর অসামান্য মেধাকে তিনি সুতীক্ষ্ণ মননশীলতার মাধ্যমে তাঁর বিভিন্ন লেখায় প্রয়োগ করেছেন বহুমাত্রিকভাবে। যে কারণে একজন হুমায়ুন আজাদকে আমরা প্রত্যক্ষ করি সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে নানাভাবে। কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, প্রবচন এবং গল্প লেখার পাশাপাশি সম্প্রতি তিনি ঔপন্যাসিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। তাঁর উপন্যাস ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল এবারের বইমেলায় বিক্রির শীর্ষ তালিকায় ছিলো। একজন ঔপন্যাসিক হিসেবে তিনি উপন্যাসের ভাষাব্যবহার, বিষয়বস্তু চয়ন এবং তাঁর শিল্পশৈলী ও প্রকরণগত ক্ষেত্রে বাঙলা সাহিত্যে ব্যতিক্রমী সংযোজন ঘটিয়েছেন; বোদ্ধা উপন্যাস পাঠকদের মধ্যে তা অনেক ক্ষেত্রেই মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে; হওয়াটা স্বাভাবিক, কারণ বাংলাদেশের সমাজ-রাজনীতি-সংস্কৃতিক অঙ্গন এখন ভুগছে মূল্যবোধের সংকটে। তাঁর ঔপন্যাসিক সত্তা এবং সমকালীন সংকটের প্রশ্নাবলি নিয়ে আজকের কাগজের পক্ষ থেকে তাঁর মুখোমুখি হয়েছিলাম।

আজকের কাগজ : কবি ও প্রাবন্ধিক হিসেবে দীর্ঘদিনের পরিচিতির পর এখন ঔপন্যাসিক হিসেবে আপনার নতুন পরিচিতির মূল্যায়ন আপনি কীভাবে করছেন?

হুমায়ুন আজাদ : আমার একটি নতুন পরিচিতি এ-বছর থেকে শুরু হলো, এখন আমার নামের আগে ঔপন্যাসিক অভিধাটিও দেখি, —দেখে আমার বেশ মজা লাগে, অনেকক্ষণ ধরে আমি বুঝতে পারি না ওই নামটা আমার কিনা? যখন নিশ্চিত হই নামটি আমারই তখন আবার মজা লাগে, কিন্তু এর পর আমি বিব্রত বোধ করি এবং ভয়ও পাই। এক ধরনের চাঞ্চল্যও বোধ করি গত কয়েক দশকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল-এর মতো সাড়া জাগায় নি। অনেক কবি এখানে উপন্যাস লিখে ব্যর্থ হয়েছেন, তথাকথিত ঔপন্যাসিকরা বছরের পর বছর উপন্যাস লিখতে ব্যর্থ হচ্ছেন। মনে হচ্ছে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বই লিখেছি, যেটি একটি উপন্যাস। অত্যন্ত অভিনব এ-উপন্যাসটি, যা আমাদের জীবন এবং কথাসাহিত্যের ভীরুতা ও সঙ্কীর্ণতাকে চুরমার করে ফেলেছে।

মননশীল পাঠকেরা এমন কিছুই চাইছিলেন যা তাঁদের ভয়ঙ্করভাবে সঙ্কীর্ণতা ও ভীরুতা থেকে উদ্ধার করবে। আমার ওপর এখন উপন্যাস লেখার বড়ো ধরনের চাপ রয়েছে, বহু প্রকাশক যে দেখা করছেন সেজন্যে নয়, আমি বোধ করছি বাঙালির বর্তমান সময় ও জীবনকে ব্যাপকভাবে উপস্থাপিত করার একটি দায়িত্ব আমার ওপর পড়েছে। আমি একটি নতুন উপন্যাস লেখার কথা ভাবছি।

আ. কাগজ : আপনি বললেন ভয়ও বোধ করেন, ভয়টা কিসের?

হুমায়ুন আজাদ : ভয়টা এতো অসচেতন যে সেটা আমি সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করে উঠতে পারবো বলে মনে হয় না। আমার মধ্যে অশেষ অতৃপ্তি রয়েছে। কোনো সাফল্যই আমার কাছে যথেষ্ট সাফল্য বলে মনে হয় না। আমি যখন সাহিত্যের কথা ভাবি, তখন বিশ্বসাহিত্যের কথাই ভাবি। বিশ্বসাহিত্যের প্রধান বইগুলো চোখের সামনে ভয়ঙ্করভাবে উপস্থিত হয়। বাংলা সাহিত্যের যে-অবস্থা দীর্ঘকাল ধরে চলছে এতে আমি অসন্তুষ্ট : বাংলা ভাষার বিখ্যাত পরিচিত বইগুলোকে বিশ্বের পরিচিত বইগুলোর পাশে রাখলে বেশ ক্ষুদ্র বলে মনে হয়। আমি যখন লিখি তখন বর্তমান বিশ্বে যাঁরা লিখছেন, যাঁদের লেখা আমি পড়েছি, তাঁদের সঙ্গে পাশাপাশি বসে লিখতে চাই। এ-উপন্যাসটিতেও আমি তাই করতে চেয়েছি। এজন্যেই ভয় লাগে, বিশ্বের সবচেয়ে দরিদ্র খুব নিম্নসংস্কৃতির অধিকারী একজন বাঙালির পক্ষে বিশ্বসাহিত্যের স্তরে ওঠা সম্ভব হয়ে উঠবে কিনা।

আ. কাগজ : ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল লিখতে গিয়ে আপনি কোন বিষয়টিকে বেশি মূল্য দিয়েছেন? শিল্প? আঙ্গিক? সমাজচিত্র? কোনটিকে?

হুমায়ুন আজাদ : ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল লেখার বছর দুয়েক আগে থেকেই আমি এমন একটি বই লেখার কথা ভেবেছি, যেটি শুধুমাত্র তার রচনাশিল্প বা গদ্যের জন্যেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল হচ্ছে ওই বইটি। বইটিকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটি সুরচিত দীর্ঘ গদ্যরচনা হিসেবে উপভোগ করা সম্ভব; কিন্তু গদ্যই সব নয়। যদিও আমি সমকালীন বাঙলায় শ্রেষ্ঠ গদ্য লেখার অভিপ্রায় পোষণ করি, আমি জানি এ পাত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরিবেশন করা দরকার। বাংলাদেশের গত কয়েক দশকের পরিস্থিতি নিয়ে আমাদের লেখকেরা নানা রকম দীর্ঘ কাহিনী লিখেছেন। তাতে ব্যক্তি, মুক্তিযুদ্ধ, ড্রইংরুম, প্রেমকাম ইত্যাদি এসেছে। কিন্তু বাংলাদেশকে, বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতিকে তাঁরা তুলে ধরতে পারেন নি। আমি চেয়েছি এমন একটি উপন্যাস, যা একটি ব্যক্তির নয়, পরিবারের নয়, ঘটনার নয়— যা সমগ্র বাঙালি জাতির। চারপাশে আমরা মাইক্রোফোনের পর মাইক্রোফোনে বহু আশার প্রলাপ শুনতে পাই। আমাদের কান, চেতনা, রক্তমাংস, স্বপ্নলোক শোচনীয় মিথ্যায় পরিপূর্ণ হয়ে আছে। আমাদের রাজনীতি যেমন মিথ্যায় আক্রান্ত তেমনি শিল্পসাহিত্যও মিথ্যা কথা বলতে ভালোবাসে। আমি এ-জাতির বর্তমান সত্যিটি উদঘাটন করতে

চেয়েছি এ-উপন্যাসে। এটি দুরূহ কাজ। একটি জাতিকে পরিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করতে গেলে কয়েক হাজার পৃষ্ঠার প্রয়োজন পড়তে পারে। কিন্তু আমি উনিশশতকি জনপ্রিয় বাস্তবতায় বিশ্বাস করি না। আমি পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদে রঙচটা বাস্তবতার উপাখ্যান বলতে চাই নি, আমি একজন সংবেদনশীল মানুষের চেতনার মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ এবং বাঙালির স্বরূপ উদঘাটন করতে চেয়েছি।

আ. কাগজ : শিল্পসাহিত্য মিথ্যায় আক্রান্ত হ'লে তার কী কী প্রতিক্রিয়া সমাজের মধ্যে ও পাঠকের মধ্যে পড়ে?

হুমায়ুন আজাদ : শিল্পসাহিত্য যখন মিথ্যায় আক্রান্ত হয় তখন বুঝতে হবে ওই জাতি তার পতনের শেষ বিন্দুতে ছুঁয়েছে। শিল্পসাহিত্যের কাজ হচ্ছে চারপাশের মিথ্যার মধ্যে সত্যকে জ্বেলে রাখা। শিল্পসাহিত্য যখন মিথ্যায় আক্রান্ত হয়, তখন বুঝতে হবে এ-জাতির মধ্যে কোনো স্বপ্ন নেই, কামনা নেই। আমাদের জনগণ তাই মিথ্যায় আক্রান্ত এবং চারপাশের শিল্পসাহিত্য মিথ্যা দিয়ে তাদের বিবশ ক'রে রাখতে চাচ্ছে; তারা বুঝতেও পারছে না— কী উৎকৃষ্ট, কী ভালো, কী মন্দ।

আ. কাগজ : ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল নিয়ে কথা উঠেছে— অনেকে বলছেন এটা উপন্যাস হয় নি, শিল্পীত গদ্য হয়েছে এবং সময়ের একটা বৃহৎ কলাম হয়েছে; এ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কী?

হুমায়ুন আজাদ : একথা যাঁরা বলেন তাঁরা আমাদের নিকৃষ্ট তথাকথিত উপন্যাসের কাঠামো সামনে রেখে কথা বলেন। এ-পাঠকেরা বা এ-ধরনের কথকেরা ঘটনার পর ঘটনা, অশ্রু ও দীর্ঘশ্বাস চান। চেতনা তাঁদের কাছে ভয়ঙ্কর ব্যাপার। সাধারণত তাঁরা নায়কনায়িকার ঘুরেফিরে প্রেম, মিলন, বিরহের ফাঁপানো গল্পকে উপন্যাস মনে করেন। বানানো রূপকথা তাঁদের কাছে ভালো লাগে। উপন্যাস সনেট নয় যে বলবো এটি সনেট হয় নি। উপন্যাসের কাঠামো দশকে দশকে বদলে যাচ্ছে। উপন্যাস সম্পর্কে কোনো পূর্ব ধারণা নিয়ে অভিনব উপন্যাস পড়া ঠিক নয়। বাঙলা সাহিত্যের লেখকেরা এবং পাঠকেরা অভিনব শিল্পের মুখোমুখি অসহায় বোধ করেন, শুধু অসহায় নয় তাঁরা বিরূপ হয়ে ওঠেন। তাঁরা পুনরাবৃত্তিতে যে-সুখ পান, অভিনবত্বে সে-সুখ পান না।

আ. কাগজ : ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল-এ অশ্লীলতার প্রাদুর্ভাব নিয়ে কথা উঠেছে। আপনার কাছে শ্লীলতা ও অশ্লীলতার সংজ্ঞা কী?

হুমায়ুন আজাদ ; ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল-এ কোনো অশ্লীলতা নেই, তবে এতে পীড়াদায়ক কিছু কামদৃশ্যের খণ্ডিত বর্ণনা রয়েছে। ওই বর্ণনা অব্যশই তীব্র, কপট বাঙালির পক্ষে তা সহ্য করা কঠিন হ'তে পারে। ওই বর্ণনা রিরংসা উদ্দীপ্ত করার জন্যে নয়, ওই বর্ণনা এতো ঘেন্না জাগাবে যে তা প'ড়ে কেউ কেউ ক্লীবও হয়ে উঠতে পারে। বাঙলা সাহিত্যে কামের বিপুল বিবরণ রয়েছে, যার লক্ষ্য

পাঠককে কামার্ত করা— লেখকরা তাই চান। কিন্তু এ-উপন্যাসে কাম ঘেন্না জাগিয়ে পাঠককে সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। শিল্পকলায় শ্লীল-অশ্লীল আমার কাছে কোনো ব্যাপারই নয়। শ্লীলতা আর অশ্লীলতা গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে গৃহস্থের কাছে, শিল্পী গৃহস্থ নন। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবিতা, উপন্যাস, চিত্রকলা এবং সঙ্গীতের বড়ো অংশই তথাকথিতভাবে অশ্লীল, কিন্তু তার সৌন্দর্যের কোনো সীমা নেই।

আ. কাগজ : ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল অল্প সময়েই পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে; পাঠকদের মনমানসে কেনো এরকম প্রতিক্রিয়া ঘটল?

হুমায়ুন আজাদ : এখানে লঘু চপল সস্তা উপন্যাসগুলো পড়ে সাধারণত বালকবালিকারা। এ-দেশের জনপ্রিয় কাহিনীকার যাঁরা, তাঁদের জনপ্রিয় না ব'লে বালকবালিকাপ্রিয় বলাই ভালো। সাধারণত প্রাপ্তবয়স্করা উপন্যাস পড়েন না, পড়লে পশ্চিমবঙ্গের একটু প্রাপ্তবয়স্ক রগরগে কাহিনী প'ড়ে থাকেন। ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল পত্রিকায় প্রকাশের শুরু থেকেই একশ্রেণীর পাঠকের মনে সাড়া জাগিয়েছে; বই আকারে বেরোনোর পর যে-সাড়া পড়েছে তা বাংলাদেশের ইতিহাসে কোনো গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাসের ক্ষেত্রে ঘটে নি। তবু আমি মাঝেমাঝে নিজেকে প্রশ্ন করি, ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল নিয়ে এমন সাড়া কেনো পড়লো? বইটি যাঁরা সংগ্রহ করেছেন, আমি বইমেলায় দেখেছি, তাঁদের মধ্যে যাঁরা কনিষ্ঠতম তাঁরা অনার্স স্তরের ছাত্রছাত্রী, আর রয়েছেন প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকেরা, যাঁদের মধ্যে ষাটপঁয়ষট্টি বছর বয়স্ক পাঠকও আছেন। তাঁরা অনেকদিন উপন্যাস পড়েন নি, উপন্যাসের নামে যা চলছে তাতে তাঁরা বিরক্ত বোধ করেছেন। আমি প্রশ্ন করি নিজেকেই, এ-পাঠকদের কী ক'রে চঞ্চল ক'রে তুললো আমার উপন্যাসটি? তাঁরা কেনো শিহরণ বোধ করলেন? মনে হয় তাঁরা এ-বইটি দ্বারা শিহরিত উত্তেজিত আনন্দিত উল্লসিত হয়েছেন এ-উপন্যাসের অসামান্য সততা ও সাহসিকতার জন্যে। আমাদের সমাজ, রাষ্ট্র, স্বপ্নজগৎ গত কয়েক দশকে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। যে বন্দিত্ব তাঁদের কাছে অসহ্য পীড়াদায়ক ব'লে মনে হচ্ছে। তাঁরা প্রতীক্ষা করেছিলেন এমন কোনো গ্রন্থের জন্যে, যে-গ্রন্থ তার অসামান্য বোল্ডনেসের সাহায্যে সামাজিক, রাষ্ট্রিক এবং স্বপ্নের জগতের সঙ্কীর্ণতাকে ভেঙেচুরে ফেলবে; তাঁদের মনের মধ্যে মুক্তির উল্লাস ছড়িয়ে দেবে। ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল সম্ভবত এ-উপন্যাস, যা দু-পায়ে লাথি মেরে টেলিভিশনের ১৮ ইঞ্চির বাংলাদেশ, ড্রইংরুম ও রান্নাঘরের উপাখ্যান ও মিনমিনে প্রেম ভালোবাসার ছককে চুরমার ক'রে দিয়েছে। এজন্যেই সম্ভবত ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকদের আকৃষ্ট করেছে।

আ. কাগজ : ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল-এর বিষয়বস্তুর বিন্যাসে এবং এর চরিত্রগুলো চিত্রায়ন সমসাময়িক মধ্যবিত্ত মূল্যবোধকে আপনি আঘাত করেছেন—

এ আঘাত সইবার ক্ষমতা এ সমাজের কতোটুকু আছে? পরিপ্রেক্ষিত বিশ্লেষণ করুন।

হুমায়ুন আজাদ : প্রশ্নটা অনেকটা বাঙলা সাহিত্যের অনার্সের প্রশ্নের মতো শোনাচ্ছে। বাঙলা ভাষায় 'মূল্যবোধ' শব্দটি এখন একটি নিরর্থক শব্দ। এটি কোনো অর্থ প্রকাশ করে না। মধ্যবিত্তের মূল্যবোধের সারকথা হচ্ছে কপটতা; আর সব ধরনের কপটতাকে আঘাত করা আমার রচনার স্বভাব। আমি গৃহীত কোনো সত্যকে কখনোই মেনে নিই নি। আমার রচনা পড়লেই বোঝা যাবে আমি সব ধরনের গৃহীত সিদ্ধান্তকে বাদ দিয়েছি। আমার সাহিত্য সমালোচনা পড়লে বোঝা যাবে আমি গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো ত্যাগ করেছি। আমার রাজনৈতিক লেখাগুলো পড়লে দেখা যাবে আমি গৃহীত মূল্যবোধ ত্যাগ করেছি। আমার এ-উপন্যাসে তা ব্যাপকভাবে দেখা যাবে। আমি চাই মধ্যবিত্তের কপট মূল্যবোধগুলোকে ধ্বংস ক'রে দিতে অর্থাৎ মধ্যবিত্ত বা সমগ্র বাঙালিকে আমি সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিতে চাই যাঁরা বিভিন্ন সুবিধা এবং স্বার্থের মধ্যে নিমজ্জিত তাঁরা এ-সত্যগুলো গ্রহণ করবেন না, আমি জানি; কিন্তু যাঁরা ভবিষ্যতের যাত্রী তাঁরা এ-মূল্যবোধ গ্রহণ করবেন। বাঙালি মুসলমান অত্যন্ত রুগ্ন একটি সম্প্রদায়; এদের কপটতার কোনো সীমা নেই। এরা যা বিশ্বাস করে না তা উচ্চকণ্ঠে বলে, যা বলে তা নিজেদের জীবনে যাপন করে না। এ-আঘাত তারা মেনে নেবে কিনা জানি না, কিন্তু তাদের বাজে মূল্যবোধগুলো ধ্বংস হওয়া অত্যন্ত জরুরি।

আ. কাগজ : ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল উপন্যাসে লেখার শৈলীগত একটা স্বতঃস্ফূর্ততা লক্ষ করা গেছে, এই স্বতঃস্ফূর্ততা কীভাবে এলো?

হুমায়ুন আজাদ : স্বতঃস্ফূর্ততা ঠিক কাকে বলে আমি জানি না; এবং আমি রোম্যান্টিকদের অর্থে স্বতঃস্ফূর্ত লেখক নই। এ-উপন্যাসের কোনো কোনো পৃষ্ঠা লিখতে আমার দু-তিন দিনও লেগেছে। আমি চেয়েছি এটি অভিনব উপন্যাস হবে, তার আঙ্গিক আর বিষয় অভিনব হবে, তার কোনো কোনো বাক্য চার-পাঁচ-ছ লাইনও হ'তে পারে। অধিকাংশ প্যারা একপাতা দেড় পাতার, যা শুনেছি, আমাদের পাঠকেরা পড়তে কষ্ট বোধ করেন। কিন্তু আমি বইটি অপাঠ্য গদ্যে লিখতে চাই নি, যেমন কমলকুমার বা আর কেউ কেউ করেছেন। আমি উৎকৃষ্ট গদ্য চাই, এবং চাই সে-গদ্য সুখপাঠ্য হবে। এ-গদ্যের জন্যেই এ-দুরূহ বইটি অনেকের কাছে স্বতঃস্ফূর্ত ব'লে মনে হয়। আমি এ-উপন্যাসে বহু প্রতীক ব্যবহার করেছি, যে-প্রতীকগুলো অসামান্য কাব্যগুণসম্পন্ন; আর প্রকৃতি বা পল্লী এ-বইয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। অনেক পাঠক ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল-এর পল্লীর বর্ণনা প'ড়ে এতো মুগ্ধ হয়েছেন যে তা নতুন অভিজ্ঞতা ব'লে মনে হয়েছে তাঁদের। আমি প্রতীকধর্মী অংশগুলো লিখতে খুব সুখ পেয়েছি, গুবরেপোকার

কাহিনী, রাশেদের বাল্যকালের উপাখ্যান লিখতে আনন্দ পেয়েছি; একনায়কের রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে এবং আমাদের সমাজ যাদের দ্বারা পীড়িত তাদের চিত্র আঁকতে গিয়ে মজা পেয়েছি। বইটিকে আমি একটি সুসংবদ্ধ সজীব প্রাণসম্পন্ন সত্তার মতো ক'রে তুলতে চেয়েছি।

আ. কাগজ : এ-উপন্যাসের মাধ্যমে আপনি কি কোনো দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন?

হুমায়ুন আজাদ : এটা দার্শনিক উপন্যাস নয়, এর মধ্যে তথাকথিত রাজনৈতিক দর্শনও নেই। তবে যদি কেউ কোনো রকমের দর্শন খুঁজে বের করতে চায় তাহলে সেটা হবে ব্যক্তির বা জাতির মুক্তির দর্শন। আমি বদ্ধতা থেকে, শোচনীয়তা থেকে মুক্তি চাই। এ-উপন্যাস সে-মুক্তির দর্শনকে ধারণ করে আছে, তবে সে-মুক্তি সম্ভব কিনা সেটাই প্রশ্ন। আমার মনে হয়েছে বাঙালি মুসলমানের মুক্তি নেই।

আ. কাগজ : চলমান সময়কে আপনি কোন দৃষ্টিতে দেখেন? বাঙালি মুসলমানের কূপমণ্ডূকতার কারণগুলো নিয়ে কি আপনি ভেবেছেন?

হুমায়ুন আজাদ : বাঙালি মুসলমানের কূপমণ্ডূকতা নিয়ে আমি সব সময়ই ভাবি, কারণ এ-কূপমণ্ডূকতায় আমরা পরিবৃত্ত হয়ে আছি; আমি ঘরের মধ্যে কূপমণ্ডূকতা দেখি, বাইরেও দেখি। বাঙালি মুসলমানের লেখা বই খুললেই কূপমণ্ডূকতা দেখি। বাঙালি মুসলমানের অবস্থা কুয়োর ব্যাঙের মতো। ব্যাঙও বোধহয় এর চেয়ে স্বাপ্নিক। মুসলমানের যা কিছু নিকৃষ্ট, হিন্দু ও বৌদ্ধের যা কিছু নিকৃষ্ট বাঙালি মুসলমান তাঁর সমষ্টি হয়ে আছে। পৃথিবীতে এখন সবচেয়ে অশিক্ষিত এবং দরিদ্র যারা তারা হচ্ছে মুসলমান। শিক্ষা ও সচ্ছলতার অভাবে তারা এখনও মধ্যযুগে পড়ে আছে এবং আমাদের দুর্বৃত্ত রাজনীতিকেরা চায় তারা মধ্যযুগেই পড়ে থাকুক। বাঙালি মুসলমানকে যদি সচ্ছল ও শিক্ষিত করা যেতো তাহলে এ-কূপমণ্ডূকতা থেকে মুক্ত করা যেতো, কিন্তু তা আজ দুরাশা মাত্র।

আ. কাগজ : বাঙলা সাহিত্যের জাড্যতা এবং বদ্ধতা সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?

হুমায়ুন আজাদ : প্রতিটি ব্যক্তির সত্তায় দুটি অংশ আছে। একটি সহজাত জন্মলব্ধ, অন্যটি সামাজিক-রাজনীতিক। কোনো সমাজের সামাজিক-রাজনীতিক জীবন যদি খারাপ হয়, তাহলে ওই সমাজের মানুষের সহজাত প্রতিভার বিকাশ ঘটে না। সমাজের দায়িত্ব হচ্ছে প্রতিটি ব্যক্তির বিকশিত হওয়ার পথ তৈরি করে দেয়া। যে-সমাজ এ-পথ তৈরি করে দেয়, সে-সমাজে প্রতিভাবানেরা দেখা দেন। আমাদের সমাজে প্রভুরা, রাজনীতির প্রভুরা চায় প্রতিটি ব্যক্তির বিকাশকে বন্ধ ক'রে দিতে। তারা সীমাবদ্ধ অসম্পূর্ণ মানুষদের শাসন করতে চায়। এমন সমাজ-রাষ্ট্রে প্রতিভাবানেরাও ঠিক মতো বিকশিত হ'তে পারেন না। সমাজ এবং রাষ্ট্রের

সঙ্গে লড়াই ক'রে অনেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যান। অনেকের শক্তির বড়ো অংশ অপচয় হয়ে যায়। তাই বিশ্বমাপের কিছু তাঁরা সৃষ্টি করতে পারেন না। আমাদের সমাজ-রাষ্ট্রে এটাই ঘটছে। 'সীমাবদ্ধতার সূত্র' নামে একটি বক্তৃতায় আমি এ-ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করেছি।

আ. কাগজ : বাঙালি কি এখন তার অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম করছে না বিকাশের সংগ্রাম করছে?

হুমায়ুন আজাদ : বাঙালি আসলে এখন কোনো সংগ্রামই করছে না। একদল রাজনীতিক কারণে বা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্যে 'বাঙালি, বাঙালি' ব'লে থাকে, এটা ক্ষমতায় যাওয়ার সংগ্রাম। এটি অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামও নয়, বিকাশের সংগ্রামও নয়। বাঙালি মুসলমান এখন কীটপতঙ্গের জীবনযাপন করছে।

আ. কাগজ : এ-পরিস্থিতিতে শিল্পসাহিত্য চর্চার প্রকৃত পন্থা কী রকম হ'তে পারে?

হুমায়ুন আজাদ : এ-পরিস্থিতিতে শিল্পসাহিত্য চর্চা থেমে যাওয়ার কথা। আমাদের এখানে খুব শিল্পসাহিত্যের চর্চা হচ্ছে, অনেকের এমন মনে হ'তে পারে; তাঁরা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলতে পারেন ওই যে নাটক কবিতা উপন্যাস লেখা হচ্ছে— খুব শিল্পসাহিত্য হচ্ছে। কিন্তু একটু ভেতরে ঢুকলে দেখা যাবে শিল্পসাহিত্যের নামে অনুকরণ চলছে মাত্র, শিল্পসৃষ্টির নামে প্রথাপালন চলছে মাত্র। আমাদের এখানে যা সৃষ্টি হচ্ছে তার বিশেষ শিল্পমূল্য নেই।

আ. কাগজ : আপনার আগামী উপন্যাস সম্বন্ধে কিছু বলুন।

হুমায়ুন আজাদ : জনদশেক প্রকাশক এর মাঝেই যোগাযোগ করেছেন— তাঁরা হয়তো ভাবছেন আর একজন পাওয়া গেলো! ইচ্ছে করলে এবার আমি বেশ কিছু অগ্রিম নিতে পারি! তবে দশটি নয়, একটি উপন্যাস আমি লিখবো। জানুয়ারি থেকেই ভাবছি, মাথার মধ্যে নিরন্তর সৃষ্টি ও নির্মাণ চলছে। বিষয় হবে আমাদের অসুস্থ পীড়িত নিয়ন্ত্রিত প্রেমকাম এবং পারিবারিক জীবনের ব্যর্থতা। একটি নামও আমার মাথায় এসেছে— সব কিছু ভেঙে পড়ে।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন : আবীর হাসান
আজকের কাগজ সাময়িকী: বৃহস্পতিবার ১৭ চৈত্র ১৪০০